সংস্কারধর্মী

ওহ্হাবী আন্দোলন

সম্পর্কিত

এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিরসন

প্রণয়নে :

ডঃ মোহাম্মাদ বিন সা'দ আল শুয়াইয়ির

উপদেষ্টা, সাউদী মুফ্‌তী প্রধান ও সম্পাদক, ইসলামী গবেষণা ম্যাগাজিন

ভাষান্তরে :

মোহাম্মাদ রকীবুদ্দীন আহমাদ হুসাইন

মুদ্রণ ও প্রকাশনায় :

ইসলামী গবেষণা ও ফাত্ওয়া বিষয়ক প্রধান কার্যালয়

ধর্মীয় প্রকাশনাদির নিরীক্ষণ বিভাগ

রিয়াদ—সাউদী আরব

আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াক্ফ

প্রথম সংস্করণ ১৪২৪ হিঃ - ২০০৩ ইং

সংস্কারধর্মী ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিরসন

প্রণয়নে :
ডঃ মোহাম্মাদ বিন সা'দ আল শুয়াইইর
উপদেষ্টা, সাউদী মুফ্তী প্রধান ও সম্পাদক, ইসলামী গবেষণা ম্যাগাজিন

ভাষান্তরে :
মোহাম্মাদ রকীবুদ্দীন আহমাদ হুসাইন

তত্ত্বাবধানে :
ইসলামী গবেষণা ও ফাত্ওয়া বিষয়ক প্রধান কার্যালয়
ধর্মীয় প্রকাশনাদির নিরীক্ষণ বিভাগ
রিয়াদ–সাউদী আরব

আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ওয়াক্ফ
প্রথম সংস্করণ ১৪২৪ হিঃ – ২০০৩ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

الناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
× × × ×

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشويعر ، محمد بن سعد بن عبد الله
تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية. / محمد بن سعد بن عبدالله الشويعر ؛
محمد رقيب الدين أحمد حسين. - الرياض، ١٤٢٣ هـ
٢٦٩ ص؛ ٢٤ سم
ردمك : ١-٢٦٩-١١-٩٩٦٠

١ - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، ت ١٢٠٦هـ ٢ - الدعوة السلفية -
السعودية أ. حسين، محمد رقيب الدين أحمد (مترجم) ب. العنوان
ديوي ٢ ، ٢١٧ ٦٢١٩ / ١٤٢٣

رقم الإيداع : ٦٢١٩ / ١٤٢٣
ردمك : ١-٢٦٩-١١-٩٩٦٠

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন এবং প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের পর নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি পাঠক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

সাউদী আরবের মান্যবর মুফ্তীপ্রধানের বিশেষ উপদেষ্টা সম্মানিত ডঃ মোহাম্মাদ বিন সা'দ আল-শুয়াই'ঈর কর্তৃক রচিত "ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিরসন" নামক গ্রন্থটি সত্যান্বেষী মুসলিম পাঠক ভাইদের জন্য নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান উপহার। ইসলামের শত্রুরা মিথ্যা ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) ও তাঁর সংস্কারমূলক বিশুদ্ধ তাওহীদি আন্দোলন সম্পর্কে নানাবিধ সংশয়-সন্দেহ ও অপবাদের যে বেড়াজাল সৃষ্টি করে রেখেছিল সম্মানিত উপদেষ্টা ডঃ মোহাম্মাদ শুয়াই'ঈর এই গ্রন্থে অকাট্য দলীল ও ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জীর দ্বারা সেগুলো খণ্ডন করতে অনেকদূর সফল হয়েছেন।

এই শত্রুরা বিশেষ করে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান চক্র তাদের হীন চক্রান্ত চরিতার্থ করার মানষে হিজরী ২য়/৩য় শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় প্রচারিত সেখানকার জনৈক আব্দুল ওহ্হাব ইবনে রুস্তুমের নামের সাথে সম্পর্কিত ওহবী বা ওহ্হাবী ফেরক্বার নামটি দুরভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যবহার করে। এটি ছিল খারিজী আবাজী মতাবলম্বী এবং আহলে সুন্নাত ও ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী একটি ভ্রান্ত ফেরক্বা। সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি ও

তাদের দোসররা মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, বিভ্রান্তি ও কলহ সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে তাদের রাজনৈতিক ও পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উক্ত ভ্রান্ত আবাজী খারিজী ফেরক্বার ওহ্হাবিয়া নামটি হিজরী দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব্য উপদ্বীপে প্রচারিত শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সংস্কারবাদী তাওহীদি আন্দোলনের গায়ে এঁটে দেয়। যে তাওহীদের প্রতি কেন্দ্রীভূত ছিল প্রথম থেকে সর্বশেষ হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত আল্লাহর সব নবী-রাসূলগণের আহ্বান।

ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের এহেন চক্রান্ত, ভ্রান্তি ও অপকর্মের ফলে দেশে-দেশে মুসলিম ভাইদের এক বিরাট অংশের মধ্যে শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের এই সংস্কারমূলক বিশুদ্ধ তাওহীদি আন্দোলন সম্পর্কে নানা প্রকার অমূলক সংশয়-সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, মুসলিমবিশ্ব অদ্যাবধি এর খেসারত দিয়ে চলছে।

দেশের ভিতরে ও বাইরে আমাদের বাংলাভাষী অনেক ভাইদের মস্তিষ্কে শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) ও তাঁর সংস্কারমূলক উক্ত তাওহীদি আন্দোলন সম্পর্কে অনেক সন্দেহ ও ভূলবুঝাবুঝি এখনও সংশ্লিষ্ট রয়েছে বিধায় এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। আশা করি, আল্লাহ্ পাক এরদ্বারা আমাকে ও আমার স্বভাষী অনেক ভাইদের উপকৃত করবেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তিনি যেন সত্যকে সত্যরূপে আমাদের দেখিয়ে তা অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন এবং বাতেলকে বাতেলরূপে আমাদের দেখিয়ে তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন!

মোহাম্মাদ রকীবুদ্দীন আহমাদ হুসাইন

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

রচনার পূর্বসূত্র

সর্ববিধ প্রশংসা নিখিল বিশ্ব–জগতের প্রভু–প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী ও সর্বোত্তম আদর্শ হজরত মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁর পরিবার–পরিজন ও ছাহাবীগণের উপর এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের পথ অনুসরণ করে চলবে তাদেরও উপর ।

কয়েক বছর পূর্বে ক্ষুদ্র পরিসরে আমি একটি বই প্রণয়ন করেছিলাম। বইটির শিরোনাম ছিল:

ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিরসন

প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠার এই বইটি ১৪০৭ হিজরী সনে মরক্কোর তাত্ওয়ান শহরে প্রথমবার ছাপা হয়। পরে ১৪১৩ হিঃ সনে দ্বিতীয়বার রিয়াদস্থ দারুল মা'আরিফ লাইব্রেরী বইটি প্রকাশ করে। বইটিতে আমি স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছি যে, শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদীরা ও আল্লাহর সত্য দ্বীনের শত্রুরা সবাই পার্থিব স্বার্থান্বেষী মহলের লোক

ছিল। এরা ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং সেসব লোকদের মোকাবেলা করতে সদা–সর্বদা প্রস্তুত থাকে যারা এই পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশ মতে তার তাওহীদ বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা করে। সেই তাওহীদ যার দাওয়াত ও বাস্তবায়ন এবং যাকে শিরকের যাবতীয় উপায়–উপকরণ থেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহপাক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সব নবী–রসূল প্রেরণ করেছেন।

এই স্বার্থান্বেষী মহল উত্তর আফ্রিকায় এককালে প্রচারিত খারিজী আবাজী নামে পরিচিত এক বিভ্রান্ত মতবাদের সন্ধান পেয়ে যায়। এই মতবাদ আব্দুল ওহ্হাব ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রুস্তম খারিজী আবাজী নামক এক লোকের নামের সাথে সম্বন্ধিত হয়ে ওহ্হাবী আন্দোলন নামে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রকাশ পায়। উল্লেখিত স্বার্থান্বেষী মহল তৎকালীন এবং পরবর্তীকালের মরক্কো ও স্পেনের উলামাবর্গের উক্ত মতবাদ সম্পর্কিত ফাত্ওয়াগুলোও সংগ্রহ করে ফেলে।

এই স্বার্থান্বেষী মহল তাৎক্ষণিক ভাবে এমন একটি বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল, যা তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয় এবং যা দিয়ে তারা শায়খ মোহাম্মাদের এই নব্য সংস্কারমূলক আন্দোলন স্তিমিত করার জন্য সাধারণ লোকের মধ্যে উদ্যোগ–উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাদের ভয় ছিল, ইসলামের পরিধি

আরো ব্যাপক হয়ে যেতে পারে। যেহেতু তারা দেখতে পেল, শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব কর্তৃক প্রবর্তিত আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ও সহায়করূপে প্রথম সাউদী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমীর মোহাম্মাদ ইবনে সাউদ ও শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব উভয় ইমাম হিঃ ১১৫৭ সনে কাঁধে কাঁধ মিলায়ে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য ও তাবলিগী আমানতের দায়িত্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার উপর পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন।

মহান আল্লাহপাক তাঁদের তাওফীক দান করলেন। যার ফলে শায়খ মোহাম্মাদের এই সংস্কারমূলক আন্দোলন সর্বত্র ব্যাপকহারে জনসমর্থন ও সহায়তা লাভে সমর্থ হয়। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশে এর প্রচার ও প্রসার শুরু হয়ে যায়। মক্কায় আগত বিভিন্ন দেশের আলেম হাজীগণ এই আন্দোলনে প্রভাবিত হতে থাকেন এবং তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে এর আহ্বান ও প্রচার শুরু করে দেন।

তাই পার্থিব সম্পদে উপকৃত স্বার্থান্বেষী মহল উক্ত আন্দোলনের এই প্রসার ও প্রচার দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দিতে প্রকাশিত সেই ভ্রান্ত রুস্তুমী ওহ্‌হাবী মতবাদকে অপ্রত্যাশিত এক হারানো বস্তু হিসেবে পেয়ে যায়, যার খবরাদি কেবল ইতিহাসের পাতায়ই অবশিষ্ট ছিল। তারা এই ভ্রান্ত আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালীন আলেমগণের ফাত্‌ওয়াসমূহ থেকে এর খবরাদিও উদ্ধার করে নেয়। তারা শায়খ মোহাম্মাদের এই নূতন বিশুদ্ধ সালাফী

আন্দোলনের গায়ে উপরোক্ত সেই ভ্রান্ত ওহ্হাবী মতবাদের পুরানো লেবাস (ওহ্হাবী নামের আবরণ) পরিয়ে দেওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। বাস্তবে সেটাই তারা করলো। এর ফলে, শায়খ মোহাম্মাদের নব্য আন্দোলনের উপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আরোপিত সেই ওহ্হাবী নামের অপপ্রচার সাধারণ মানুষের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে শুরু করে। কারণ, এই পার্থিব স্বার্থান্বেষী মহল সত্যের বিকৃতি ও জনগণের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। মানুষ সাধারণতঃ সত্যের যাচাই–বাচাই ও গুরুত্ব প্রদানের তুলনায় মিথ্যার অপপ্রচারে আধিকতর প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। তাই, দেখা যায়, ধ্যান–ধারণার পরিবর্তন ও বাস্তববিরোধী কল্পনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপপ্রচার বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা সৎনিয়তেও হতে পারে, আবার দূরভিসন্ধিমূলক অথবা পারস্পরিক ভুল বুঝাবঝির মাধ্যমেও হতে পারে।

গত ১৪০৭ হিজরী সনের কোন এক সময়ে শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সংস্কারমূলক আন্দোলন সম্পর্কে মরক্কোর একজন আলেমে দ্বীনের সাথে আমার দলীলভিত্তিক এক প্রাণবন্ত আলোচনা অত্যন্ত সন্তোষজনক ও ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং এর ফলে সেখানে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত এক ঐতিহাসিক ভুলের অপনোদন সাধিত হয়।

বিতর্কের এই ঘটনাটি সম্পর্কে আমার কাছ থেকে মৌখিকভাবে

জানার পর অনেক সুহৃদ ভাই উক্ত বইটি রচনার পূর্বসূত্র লিখিত ভাবে বর্ণনা করার জন্য আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন। কেননা, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এটা অধিকতর কার্যকরী এবং সম্ভাব্য অধিকসংখ্যক লোক এ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এছাড়া এই পন্থায় আগামী দিনের উৎসাহী লোকদের জন্যও কর্মটি জীবন্ত থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমার সুহৃদ ভাইদের উৎসাহে সাড়া দিয়ে বলছি ঃ

'ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিরসন' গ্রন্থটি যে উপলক্ষে রচনা করেছি, তাতে পাঠকের সাথে আমার অংশগ্রহন সম্ভবতঃ সঙ্গতিপূর্ণ মনে করছি। কারণ, আল্লাহপাক প্রত্যেক বিষয়ের পূর্বসূত্র বা কারণ–উপকরণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এই যে বিতর্ক অনুষ্ঠান যেখান থেকে এক সন্তোষজনক ও দল–ীলভিত্তিক আলাপ–আলোচনার এবং শান্ত ও ফলপ্রসূ বিতর্কের জন্ম লাভ করে, প্রকৃতপক্ষে, এটিই ছিল এই গ্রন্থটি রচনার প্রত্যক্ষ কারণ।

গত ১৪০৭ হিজরীতে কোন এক বিশেষ কাজ উপলক্ষে আমি পশ্চিম আফ্রিকার এক মুসলিম রাষ্ট্র 'মুরিতানিয়া' সফরে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে সেনেগাল হয়ে ঘুরে আসতে হলো। বিমান পথের জটিলতার দরুণ আমাদেরকে ছয়দিনের জন্য মরক্কোতে অবস্থান করতে হয়।

মরক্কোতে অবস্থানকালে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের বাসায় একদা মেহমান হয়ে গিয়েছিলাম। অধ্যাপক

সাহেবকে এই গ্রন্থে আমি সংক্ষেপে ডঃ আব্দুল্লাহ নামে উল্লেখ করবো। তার নিজস্ব লাইব্রেরীকক্ষে আমরা অন্যান্য মেহমানদের সাথে বৈঠকে বসি। এই বৈঠকে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা হয়। সাউদী আরবের প্রতি সম্মানিত অধ্যাপকের অকৃত্রিম ভালবাসা ও সেখানে একাধিক সম্মেলন–সেমিনারে তার যোগদানের কথা উল্লেখ করে তিনি উপস্থিত ১০/১২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে আমার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন :

'আমরা সাউদী আরবকে অত্যন্ত ভালবাসি। প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরাত্মা সেই দেশের প্রতি সদা আকৃষ্ট। আপনাদের ও আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে ঢের এবং উভয় দেশের শাসক ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছে সমঝোতা ও সহযোগিতার গভীর অগ্রহ। সাউদী সরকার ও সেখানকার উলামাবর্গ নিষ্ঠার সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যে সমস্ত খেদমত আন্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তা আমরা গর্ব ও বিষ্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি। তবে, কতই না ভাল হত, যদি তারা ওহ্হাবী মতবাদ ছেড়ে দিত, যা বিশ্বের মুসলমানদের শতধা বিভক্ত করে রেখেছে ।'

উত্তরে আমি বললাম : সম্ভবতঃ সঠিক উৎস থেকে সংগৃহীত নয় এমন অনেক ভুল তথ্য অনেক লোকের মনমস্তিষ্কে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে। তবে, বিভিন্ন মতামতের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সমঝোতার খাতিরে আমি মনে করি, বিষয়টির উপর উপস্থিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে দলীলভিত্তিক বিতর্কে আমরা অবতরণ করতে

পারি। এরপর আমি বললাম:

যেহেতু, প্রত্যেক লোক তার দেশবাসী উলামাবর্গের লিখা গ্রন্থ ও রচনাবলী থেকে আত্মতৃপ্তি ও স্বস্তি লাভ করে; সুতরাং, এই বিতর্কের সময় আমি এই লাইব্রেরীর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত বই–পুস্তকের বাইরে যাব না। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন, আমি কোন বইপত্র সাথে নিয়ে আসিনি এবং এই বিতর্কে জড়িত হওয়ার কোন পূর্ব ধারণাও আমার ছিল না। তাই বিতর্কের প্রারম্ভে আশা করবো আমাদের এই আলোচনা উত্তেজনা বা কোন প্রকার পক্ষপাতদুষ্টে কলুষিত হবে না অথবা এতে সন্তোষজনক দলীল–প্রমাণ ব্যতিরেকে কারো উপর কোন মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিবে না। যেহেতু, আমাদের উদ্দেশ্য সত্যের অন্বেষণ, আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ এবং আমাদের সকলের প্রত্যাশা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করা।

আমার কথায় সায় দিয়ে জনাব অধ্যাপক সাহেব বললেন: এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত এবং উপস্থিত উলামাবর্গ আমাদের এই বিতর্কে ফয়ছালা দিবেন।

আমি বললাম: এতে আমি রাজী আছি। আল্লাহর উপর ভরষা করে কোন এক সূত্র ধরে বিতর্কের সূচনা করুন।

তিনি বললেন: উদাহরণ স্বরূপ আমরা এই মূহূর্তে 'আল ওয়ানসুরাইসি' তাঁর আল মি'য়ার গ্রন্থের ১১তম খণ্ডে যা উল্লেখ

করেছেন তা আলোচনায় আনতে পারি। তিনি উল্লেখ করেছেনঃ

"শায়খ লাখামী (রহঃ) কে কোন এক শহরবাসীর পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হলো: 'যেখানে ওহ্হাবীগণ কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে' সেখানে তাদের পক্ষে সেই মস্জিদে নামাজ পড়ার হুকুম কি? (১)

জ্ঞাতব্য যে, আল মি'য়ার গ্রন্থটি মালেকী মাজ্হাবের ফেক্হা অনুযায়ী লিখিত ফাত্ওয়ার সমষ্টি। শায়খ আহমদ ইবনে মোহাম্মদ 'আল-ওয়ানসুরাইসী' ১৩খণ্ডে এটি সংকলন করেছেন। মরক্কো সরকার এই বিরাট গ্রন্থটি নিজ খরচে ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন।

প্রশ্ন উত্থাপনের পর এবং উক্ত গ্রন্থের ১১তম খণ্ডটি উপস্থিত করার পর আমি এর উত্তরে বললাম: এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত ফাত্ওয়া সঠিকই হয়েছে এবং ফাত্ওয়ার অন্তর্ভূক্ত বিষয়ে আমি শায়খ লাখামীর সাথে একমত। তখন অধ্যাপক সাহেব বললেন: তাহলে, এই দল এবং তাদের ভ্রান্তির ব্যাপারে আমরা একমত হয়ে গেলাম। বিশেষ করে মুফতী লাখামী তো বলেই দিয়েছেন যে, এটি একটি খারিজী পথভ্রষ্ট কাফেরের দল। আল্লাহপাক তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিক। তাদের নির্মিত মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়া

১-দেখুন: 'আল-মি'য়ারুল মু'রিব ফী ফাতাওয়া আহলিল মাগরিব' ১১তম খণ্ড, পৃ: ১৬৮। এই গ্রন্থে প্রশ্নটি আরো ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত রয়েছে।

অপরিহার্য এবং মুসলিম বিশ্বজগত থেকে এদের বিতাড়িত করতে হবে।

আমি বললাম: এখনও আমরা পূর্ণমাত্রায় একমত হতে পারিনি। আমরা এখনও বিতর্কের শুরুতে অবস্থান করছি। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি, এই দলের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ফাত্ওয়ার অনুরূপ আরো অনেক ফাত্ওয়া শায়খ লাখামীর পূর্বে ও তার পরে জারী করা হয়েছে। স্পেন ও উত্তর অফ্রিকার উলামাবর্গের কাছে সেগুলো মওজুদ রয়েছে। এগুলোর উৎস হলো সেই খাওয়ারিজদল সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুকুম যাদের বিরুদ্ধে আলী (রাজি য়াল্লাহু আনহু) নাহরাওয়ান নামক স্থানে যুদ্ধ করেছিলেন।

আমরা এই বিতর্ক অনুষ্ঠানে আল্লাহ চাহে তো দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্পর্কিত ভুল সংশোধনে সক্ষম হতে পারবো।

একটি হলো ঃ সেই দলের প্রকৃত অবস্থান, যাদের সম্পর্কে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম উলামাবর্গের ফাত্ওয়া জারী হয়েছে;

দ্বিতয়টি হলো ঃ শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) এর সংস্কারমূলক আন্দোলনের উপর অবজ্ঞাস্বরূপ যে নামকরণ এঁটে দেওয়া হয়েছে ।

এই ঐতিহাসিক ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন কেবল তখনই

সন্তোষজনক হতে পারে যখন তা আপনাদের সম্মুখে গ্রহণযোগ্য যুক্তি–প্রমাণের দ্বারা উপস্থাপন করা হবে। কেননা, আমাদের সবাইর লক্ষ্য হলো, প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে সাফল্য লাভ করা এবং শান্ত ও সন্তোষজনক মতামতের দ্বারাই ভ্রান্তির মুখোশ উন্মোচন করে সমূহ ভুল–বুঝাবুঝির অবসান ঘটানো।

অধ্যাপক সাহেব বললেন, আমরা সবাই এই সত্যের অন্বেষণে রয়েছি। এরপর তিনি বললেন, উপরোক্ত ফাতওয়া সম্পর্কে আমাদের অবগত করানোর পর আপনার কাছে আর কি বলার আছে, আমরা জানতে চাই? আমরা আপনার কথা শুনবো এবং উপস্থিত উলামা ভাইগণ এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ফয়ছালা করে দিবেন। তাদের সম্মুখে যা বলা বা উপস্থাপন করা হবে তাঁরা তা যাচাই–বাচাই করে দেখবেন এবং ভুল হলে তাঁরা তা শুদ্ধ করে দিবেন, আর শুদ্ধ হলে তাও তারা স্পষ্ট করে বলে দিবেন।

উত্তরে আমি বললাম: ইন শা আল্লাহ্, বিষয়টি সুস্পষ্ট করার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার আগ্রহী ব্যক্তির জন্য আপনারা আলোকবর্তিকা দেখতে পাবেন। এজন্য আমরা 'আল মি'য়ার' গ্রন্থের উপস্থিত খণ্ডসমূহ দিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। অনুগ্রহ করে উক্ত গ্রন্থের উপস্থাপনা পড়ুন, যাতে উপস্থিত ভাইগণ তা সরাসরি শুনতে পারেন।

তিনি বললেন, আপনি কি চান উনাতের সম্মুখে শুধু ফাত্ওয়াটি পড়ে শুনাবো ? না, বাহিরের কভারে যেসব তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে তা থেকে পড়া শুরু করবো ?

আমি বললাম: বাহিরের অথবা ভিতরের কভার উভয়টিই সমান, যে কোন একটি পড়ে শুনাতে পারেন।

তিনি পড়লেন: গ্রন্থের নাম 'আরবী ভাষায় অনূদিত মরক্কোবাসী উলামাদের ফাত্ওয়া', রচনায়– আহমদ ইবনে মোহাম্মাদ আল ওয়ানসুরাইসী; মৃত– ৯১৪ হি:, ফাস, মরক্কো।

মজলিসে উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ একজন শায়খ, যিনি ধীরচিত্ত ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন, নাম তার– আহমাদ, তাকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম: শায়খ আহমদ, গ্রন্থটির লিখক আহমাদ আল ওয়ান সুরাইসীর মৃত্যুর তারিখটি লিখে রাখুন। আমার অনুরোধক্রমে তিনি লিখলেন–৯১৪হিঃ।

আমি অধ্যাপক সাহেবকে বললাম: আপনি আল লাখামীর জীবণ–চরিতটি হাজির করতে পারেন কি ? তিনি বললেন, হাঁ বলে সম্মুখের সেল্ফ থেকে গ্রন্থটির একটি খণ্ড হাজির করলেন, যার মধ্যে ছিল আলী ইবনে মোহম্মদ আল লাখামীর জীবণ–চরিত। তিনি ছিলেন স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুফ্তী। এই খণ্ডের মধ্যে তার দীর্ঘ জীবন–বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ ছিল। এতে তার ও তার জ্ঞানচর্চার প্রশংসার

উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাকে বললাম: জীবণ–বৃত্তান্তের শেষের দিকে কবিতার যে অংশটি রয়েছে তাতে তার মৃত্যুর তারিখ কত, তা লিপিবদ্ধ আছে।

পাঠক বললেন, তাঁর মৃত্যুর তারিখ হলো– হিঃ ৪৭৮ সন। (১)

আমি শায়খ আহমাদকে বললাম: শায়খ লাখামীর মৃত্যুর তারিখটি লিখে রাখুন। তিনি লিখে রাখলেন– মৃতঃ ৪৭৮ হিঃ

ডঃ আব্দুল্লাহ বললেন: আপনি কি আমাদের উলামাগণ ও তাদের ফাত্ওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন ? আমি বললাম: এই সন্দেহ পোষণের পিছনে আপনার দলীল কি ? এরপর উপস্থিত উলামাবর্গের প্রতি লক্ষ্য করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি আমার কাছ থেকে এমন কিছু পেয়েছেন যাতে এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে ? তারা সমস্বরে না–ই করলেন ।

আমি বললাম, আমার বা আমার দেশের উলামাবর্গের প্রতি সংশয়–সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলছি । কেননা, আমরা তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করি এবং আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আলোকে জারীকৃত তাদের সমূহ ফাত্ওয়াকে আমরা সঠিক মনে করি। আমরা এখন যে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়ছালায় পৌছার জন্য আলোচনা শুরু করছি সে আলোচনা দলীলভিত্তিক হওয়ার সাথে সাথে আমাদের মধ্যে সংযম

---

(১) দেখুন: 'আল হুলালুস সুন্দুসিয়া–১৪২, এতে লিখা আছে যে, বাসফাক্বিসেই তার মৃত্যু হয়েছে; আল আ'লাম–৫:১৪৮।

ও ধৈর্য্য প্রদর্শনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

সুতরাং কালক্ষেপণ না করে আমি আপনাদের সবাইর প্রতি এই প্রশ্ন উথ্থাপন করছি: এটা কি সম্ভব, এমন কোন মতবাদের উপর উলামাবর্গ কোন ফাত্ওয়া জারী করতে পারেন যে মতবাদের প্রবক্তা তখনও জন্মগ্রহণ করেননি অথবা এমন কোন সম্প্রদায়ের উপর ভাল–মন্দের ফায়ছালা কি প্রদান করা যেতে পারে যার আবির্ভাব তখনও ঘটেনি ?

উপস্থিত সবাই উত্তরে বললেন ; না, এমনটি কখনও হতে পারে না। কেবল তা–ই হতে পারে যে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর দিয়েছেন। এটা তো নবুওতী মু'জেজার (আলৌকিক ঘটনার) অন্তর্ভুক্ত এবং তা সধারণতঃ গুণাগুণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ভিত্তিক হয় না।

যিনি আমার সাথে কথা বলছিলেন তাকে সম্বোধন করে আমি বললাম: আপনি কি বিশ্বাস করেন না, বা আপনি ভিন্ন অন্যরাও কি বিশ্বাস করে না যে, সর্বপ্রথম যিনি বর্তমান সাউদী আরবের নজদ অঞ্চলে ওহ্হাবী মতবাদ চালু করেছেন তিনি হলেন শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ? তিনি বললেন, হাঁ, তখন আমি বললাম:

'শায়খ লাখামী ও অন্যান্য স্পেনদেশীয় মালেকী উলামাবর্গ যখন ফাত্ওয়া জারী করেন তখন পর্যন্ত শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল

ওহ্হাবের ২০/২২তম পূর্বপুরুষের জন্মও হয়নি। যদি ধরা হয়, সাধারণতঃ প্রতি এক শতাব্দীতে তিনজন পুর্বপুরুষ, সেই হিসেবে আব্দুল ইবনে রুস্তম ও শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের মধ্যে একত্রিশজন পূর্বপুরুষের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। আপনাদের উলামাবর্গ তথা মুসলিম মনিষিগণ ইলমে গাইব (অদৃশ্যজ্ঞান) জানেন না। তাদেরকে আমরা যাদু বা গণকতা থেকে পবিত্র মনে করি। তারা যা জানেন না তা তারা বলেন একথাও আমরা বলিনা। অল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

অর্থ: " বল, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলে কেউ ইল্‌মে গায়েব জানে না এবং তারা কেউ জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।" সূরা নামাল: আয়াত—৬৫)

অধ্যাপক সাহেব বললেন, বিষয়টি আরো একটু পরিষ্কার করে বলুন।

আমি বললাম : জেনে রাখুন, শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের জন্ম ১১১৫ হি: সনে এবং তাঁর মৃত্যু ১২০৬ হি: সনে। তাঁর মধ্যে এবং আহমদ 'আল ওয়ানসুরাসী' (যিনি আল মি'য়ার গ্রন্থের লিখক এবং যিনি লাখামী থেকে ফাত্ওয়ার কপি করেছেন) এর মধ্যে মৃত্যুর তারিখ অনুযায়ী সময়ের ব্যবধান হলো ২৯২ বৎসর। এভাবে শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ও আল লাখামীর

(যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন) উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো মৃত্যুর অনুযায়ী ৭২৮ বৎসর, যা এখানে উপস্থিত সম্মানিত শেখ আহমাদ কিছুক্ষণ আগে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

এর উপর ওহ্হাবী মতবাদ সম্পর্কে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের উলামাগণ যা লিখেছেন তার একটা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

অধ্যাপক সাহেব বললেন, আপনি যা বলতে চাচ্ছেন সন্তোষজনক দলীল–প্রমাণসহ তার আরো একটু বিশ্লেষণ প্রদান করতে পারেন কি ?

আমি বললাম: উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের উলামাবর্গ ওহ্হাবী মতবাদ সম্পর্কে ফাত্ওয়া প্রদানের প্রতি এতই গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন কেবল এজন্যেই যে, এই বিষয় তাদের দেশে বিদ্যমান ও আলোচিত ছিল। তখনকার দিনে অন্য কোন মুসলিম দেশে উহার অস্তিত্ব ছিলনা, যে সব দেশের বিভিন্ন দল ও ফেরক্বা সম্পর্কে আল্লামা শাহরিস্তানী তাঁর 'মিলাল ওয়ান নিহাল' নামক গ্রন্থে (১) এবং ঐতিহাসিক ইবনে হযম তাঁর ' আল ফাছল ফিলমিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল' নামক নামক গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন।(২) দেখা যায়, ঐ উভয় গ্রন্থে ওহ্হাবী নামে কোন দল বা ফেরক্বার উল্লেখ নেই।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফরাসী লিখক 'আলফ্রেড বেল' এর লিখিত (উত্তর আফ্রিকায় ইসলামী দলসমূহ) নামের বইটি কি আপনার কাছে আছে, যা আব্দুর রহমান বাদাভী কর্তৃক আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

---

(১) দুই খণ্ডের এই গ্রন্থটি দেখুন, এতে ওহ্হাবিয়া নামে কোন ফের্ক্বার উল্লেখ নেই।

(২) চারখণ্ডের এই গ্রন্থটি দেখুন, এতে ওহ্হাবিয়া নামে কোন ফের্ক্বার উল্লেখ নেই।

অধ্যাপক সাহেব বললেন, হাঁ, আছে। এই বলে তিনি বইটি নিয়ে আসলেন।

আমি বললাম, আমরা বইটির শেষের দিকে 'ওয়াও' অক্ষরের অংশটি পড়ে দেখতে পারি। তখন মজলিসে উপস্থিতদের মধ্য হতে একজন পড়লেন :

"ওহবিয়া অথবা ওহ্হাবিয়া একটি খারিজী আবাজী ফের্ক্বা যার জন্মদাতা আব্দুল ওহ্হাব ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রুস্তুম খারিজী আবাজী। তারই নামানুসারে এই ফের্ক্বার নাম 'ওহ্হাবিয়া' নামকরণ করা হয়। সে তার এলাকায় ইসলামী শরীয়ত বন্ধ করে দেয় এবং হজযাত্রা বাতেল ঘোষণা করে। ফলে, তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ সংগঠিত হয়।......... এই আব্দুল ওহ্হাব হিজরী ১৯৭ সনে উত্তর আফ্রিকার তার্থ নামক শহরে মৃত্যু বরণ করে।"

গ্রন্থকার আরো উল্লেখ করেন যে, তার এই ফেরক্বাকে উক্ত নামে আখ্যায়িত করা হয় এজন্যে যে সে ধর্মে অনেক পরিবর্তন–পরিবর্ধন সাধন করেছিল। তারা শিয়া মতবাদকে এতটুকু ঘৃণা করত যতটুকু সুন্নী জামা'আতকে ঘৃণা করত।[১] গ্রন্থকার আলফ্রেড বেল তার এই পুস্তকে আরববিজয় থেকে নিয়ে প্রায় বর্তমান যুগ পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দলগুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

এই আব্দুল ওহ্হাব রুস্তুমের মৃত্যুকাল সম্পর্কে জীবনী লিখকদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। 'যারকালী' স্বীয় 'আল আ'লাম' গ্রন্থে তার মৃত্যু সন ১৯০ হি: উল্লেখ করেছেন।[২]

---

১) দেখুন এই গ্রন্থের ১৫০ ও ১৪০–১৫২ পৃষ্ঠা

২) আল আ'লাম–৫:১৯৮, মুদ্রণে– দারুল ইলম লিল মালাঈন।

আমি অধ্যাপক সাহেব ও উপস্থিত সুধীবর্গকে সম্বোধন করে বললাম: এটাই হলো সেই ওহ্হাবী মতবাদ যা মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং যে মতবাদ সম্পর্কে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার উলামাগণ ফাত্ওয়া জারী করেছিলেন। আক্বিদাহ সম্পর্কিত তাদের গ্রন্থসমূহে এর উল্লেখ পাবেন। এই সম্পর্কে তারা যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন।

পক্ষান্তরে, শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের মতবাদ একটি সংস্কারধর্মী সালাফী মতবাদ। তৎকালীন স্থানীয় আমীর মোহাম্মদ ইবনে সউদ এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই মতবাদ খাওয়ারিজ ও তাদের কার্য–কলাপ বিরোধী। কেননা, এই মতবাদের ভিত্তি আল্লাহর কিতাব ক্বোরআন ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বিশুদ্ধ সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই উভয় ভিত্তির পরিপন্থী বিষয়কে এই মতবাদের অনুসারীরা পরিহার করে চলে। এরা সত্যিকার ভাবে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।

এই মতবাদ বা আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে যে সংশয়–সন্দেহ বিরাজ করছে তা মূলতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু সম্রাজ্যবাদী ও তাদের দোসরগণ কর্তৃক প্রচারিত, যাতে এরদ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাসগত বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার বিষ্পাপ ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় সম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। তাদের দাপট ও আধিপত্য চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। ক্রুসেডযুদ্ধের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা ভাল করেই জেনে নিয়েছিল যে, তাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় হলো: নির্ভেজাল ইসলাম,যা সালাফী মতবাদে বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, তারা উপরোক্ত রুস্তুমী ওহবীয়া মতবাদের মধ্যে একটা প্রস্তুত (রেডীমেইড) পোষাক পেয়ে গেল যা

সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ–বিচ্ছিন্নতা ও হিংসা–বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে পরবর্তী এই সংস্কারমূলক মতবাদ বা আন্দোলনের গায়ে পরিয়ে দেয়। কেননা, তাদের নীতি ছিল: 'বিভক্ত কর এবং শাসন কর।" স্মরণযোগ্য যে, মুসলিম বীর ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী কেবল তখনই সিরীয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করতে পেরেছিলেন. যখন তিনি মিশরের ফাতেমী আবিদী বাতিনী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ছিলেন।[১] এরপর তিনি সিরীয়া থেকে সুন্নী আলেমগণকে এনে মিশরের বিভিন্ন শহরে–উপশহরে ও গ্রামে–গঞ্জে প্রেরণ করেন।

ফলে, শীয়া বাতিনী সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মিশর কার্যতঃ ও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে স্পষ্ট সুন্নী পদ্ধতির জীবন পথে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামের পুনর্জাগরণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, যখন তারা দেখতে পায়, সুন্নাত ও তাওহীদের রাষ্ট্র দুজন মুসলিম নেতা: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ও মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ও তাদের পরবর্তীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে এবং দিনদিন এর প্রতি লোকের জনসমর্থন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি তাদের রাষ্ট্রের পরিধিও বেড়ে চলছে। আপনাদের জানা আছে, সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই কোন মুসলিম দেশে প্রবেশ করতে পেরেছে তখনই তারা সেখান থেকে আহলে সুন্নাতকে সরানোর চেষ্টা করছে এবং বেদ'আতপন্থী ও প্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের নিজেদের দলে ভিড়ানোর প্রয়াস চালিয়েছে। কেননা, মুসলিম দেশে তারা যখন কোন অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় তখন তারা ঐসব লোকদের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

---

(১) দেখুন, 'তারিখে তাবারী' ও ইবনে আছীরের 'কামেল'।

আমার ধারণা হয়েছিল যে, আমার এই উত্তরই উপস্থিত লোকদের জন্য তুষ্টকর ও সন্তোষজনক হবে। কিন্তু তাদের একজন অন্য একটি প্রশ্ন করে বসলো। প্রশ্নকারী বললেন : এটা কি হতে পারেনা যে, হয়তো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব পূর্ববর্তীদের মতবাদ গ্রহণ করে উহাকে নতুনভাবে পুনর্জীবিত করেছেন এবং তাদের পন্থা অনুসরণ করে আন্দোলন চালিয়েছেন ?

উত্তরে আমি বললাম :

প্রথমতঃ এটাতো হতেই পারেনা, এ কারণে যে, উভয় স্থানের মধ্যে দূরত্বের ও যোগাযোগের দূরূহতার ফলে উক্ত মতবাদ সম্পর্কে যথাযথ খবরাখবর সেখানে পৌঁছায়নি। আব্দুল ওহ্হাব ইবনে রুস্তুম এর মতবাদের কথা আরব উপদ্বীপের ইতিহাসের কোথায়ও কোন উল্লেখ নেই। এমনকি, যেমন উপরে বলা হয়েছে, এই মতবাদ সম্পর্কিত কোন রচনা বা গ্রন্থ্ সেখানকার বিভিন্ন ফেরক্বা, মতবাদ বা সম্প্রদায়ের পাঠকবর্গ ও ঐতিহাসিকদের হাতে পড়েনি, যেমন, শাহ্‌রিস্তানী, ইবনে হযম প্রমুখ ইতিহাস– বেত্তাগণ। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রশ্নোত্তরেও এর কোন অস্থিত্ব নেই। এইসব গ্রন্থকারদের বহু পূর্বেই ইবনে রুস্তম মৃত্যুবরণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আব্দুল ওহ্হাব ইবনে রুস্তুমের আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার পূর্বে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ –

শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলন কিতাব ও সুন্নাহ বিরোধী সব আন্দোলন থেকে ভিন্ন। কারণ, তাঁর আন্দোলন ছিল সালফে ছালেহীনদের পথ অনুসরণে এক সংস্কারবাদী আন্দোলন। এর পরিপন্থী কোন নূতন বিষয় তিনি নিয়ে আসেননি।

তৃতীয়তঃ –

শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব(রহঃ)এর আন্দোলনকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে 'ওহ্হাবী মতবাদ বা ওহ্হাবী আন্দোলন' নামকরণ ভাষাগত একটা ভুলও বলা যায়। কারণ, তাঁর পিতা আব্দুল ওহ্হাব এই আন্দোলন শুরু করেননি। যদি তিনি করতেন তা হলে পিতা ও তাঁর ছেলেরা সবাই এই সম্বন্ধকরনে শরীক থাকতেন, যেখানে শায়খ মোহাম্মদ তাদেরই একজন ছিলেন।

চতুর্থতঃ –

শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব আবাজিয়া খাওয়ারিজদের কোন মতের সাথে একমত হননি। তাদের ছাড়া আহ্লে সুন্নাতের উলামাগণ মুসলিম বিশ্বে আবির্ভূত যে সব বিভ্রান্ত ফের্ক্বার নিন্দা করেছেন সেগুলোর কোনটির সাথেও তিনি একমত হননি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ও পুস্তিকাসমূহ এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে।

পঞ্চমতঃ –

তাঁর প্রতি যে সব বিষয় আরোপ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে যদি আপনারা সময় দেন তা হলে আমি সাক্ষী–প্রমাণ উপস্থিত করতে পারি যে, তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা তাঁর প্রতি মিথ্যা ও অপবাদস্বরূপ আরোপিত এই বিষয়গুলো থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করেছেন। লক্ষণীয় যে, একজন মানুষের প্রতি এমন বিষয় কিভাবে আরোপ করা যায়, যা থেকে সে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে।

আমরা এখন আমাদের বির্তক ও আলোচনার পর্বে সমাপ্তির পথে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমরা এই লাইব্রেরীর মধ্যেই হয়তো এমন কিছু পেয়ে যেতে পারি যা অনেকের মন–মস্তিষ্কে সংশ্লিষ্ট

নানাবিধ সংশয়—সন্দেহ দূরীকরণে সহায়ক হতে পারে। 'সত্য ও হেকমতের বিষয়ই তো মুমেনদের হারানো সম্পদ।'

এরপর আমি বললাম: সম্ভবতঃ এখানে আপনাদের এলাকা সম্পর্কে লিখিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ পেয়ে যাব । গ্রন্থটির নাম :'উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস', রচনা করেছেন একজন পাশ্চাত্য ফরাসী লেখক, যার নাম হলো: শারলী আন্দরে। গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন: তিউনিসিয়ার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মোহাম্মাদ মাযালী ও বশীর সালামা।

ডঃ আব্দুল্লাহ বললেন : হাঁ, বইটি এখানে আছে। এই বলে তিন খণ্ডের এই বইটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে সামনে হাজির করলেন।

সূচীপত্র দেখে আমি বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত খাওয়া—রিজদের সাম্রাজ্য সম্পর্কীয় অংশ থেকে পড়তে শুরু করি। এর মধ্যে 'থার্ত' রাজ্যের কথাও সংযোজিত ছিল। এটিই ছিল রুস্তুমিয়া সাম্রাজ্য। লেখক এর মতাদর্শ, ব্যাপকতা, নাগরিক বৈশিষ্টাবলী এবং রাষ্ট্রীয় মতবাদকে 'ওহ্হাবিয়া' নামকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত মতবাদের এই নামকরণ আব্দুল ওহ্হাব ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রুস্তুম এর প্রতি সম্বন্ধিত ছিল, যে রুস্তুম তার স্বীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধিতা করেছে। লেখক উক্ত গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যে, এই ওহ্হাবিয়াহ রুস্তুমিয়াহ মতবাদ আক্বীদাহগত দিক দিয়ে আহ্লে সুন্নাহর বিরোধী। (১)

---

(১) 'উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস',পৃঃ ৪০—৪৫ ও অন্যান্য স্থানে।

এরপর আমি বললাম, সম্ভব হলে আরেকটি বই দেখাতে পারেন, যদি আপনার লাইব্রেরীতে থেকে থাকে। সেটি হলো– 'আল–মাগরিবুল কাবীর' (আল আছরুল আব্বাসী), রচনায় : ডঃ সাইয়্যিদ আব্দুল আযীয সালিম।

তিনি বললেন, হাঁ, আছে। এই বলে তিনি বইটি আমার সামনে পেশ করলেন। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে মরক্কোর 'থার্ত' শহরে রুস্তুমি রাজ্য সম্পর্কে লিখিত অংশটি আমরা উভয়ে পড়লাম। সেখানে লেখা রয়েছে : পারস্য বংশোদ্ভূত আব্দুর রহমান ইবনে রুস্তুম ১৭১ হিঃ সনে যখন তার মৃত্যু আসন্ন হওয়ার আভাস পায় তখন সাতজন সর্বোত্তম সরকারী কর্মচারীর প্রতি ওছিয়তের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ করে। তার মধ্যে আপন ছেলে আব্দুল ওহ্হাব ও ইয়াযীদ ইবনে ফানদীকও ছিল। পরবর্তী সময়ে আব্দুল ওহ্হাবের হাতেই বায়'আত করা হয়। এর ফলে, আব্দুল ওহ্হাব ও ইবনে ফানদীকের মধ্যে বিবাদ–বিসম্বাদ শুরু হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে এই আবাজিয়া মতবাদ, যা ইবনে রুস্তম ও তার সহচরদের ধর্ম ছিল, বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রধানতঃ দুটি ফিরক্বায় এর বিভক্তি সাধিত হয়। একটি হলো: ওহ্হাবিয়া, যা আব্দুল ওহ্হাব ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে রুস্তম এর নামের সাথে সম্বন্ধিত হয় এবং অপরটি হলো : নাকারিয়্যাহ।

এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন সময় অনেক যুদ্ধ–বিগ্রহ ঘটে। শেষ পর্যন্ত নাকারিয়্যাহ দল ওহ্হাবিয়া দলের কাছে পরাজয় বরণ করে এবং দলের নেতা ইবনে ফানদীক নিহত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, নাকারিয়্যাহ দলের এই দুর্বল মুহূর্তে ওয়াছিলিয়া মু'তাজিলা নামক

একটি বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের সাথে এসে যোগদান করে।

তারপর গ্রন্থকার বলেন: এই আব্দুল ওহ্হাব ইবনে রুস্তম তার শেষ বয়সে পবিত্র হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করেছিল, কিন্তু আব্বাসী শাসকদের ভয়ে তার অনুসারীরা তাকে হজ্জে না গিয়ে নাফ্‌ফুসা নামক স্থানে অবস্থান করার পরমর্শ দেয়। (১)

এর পর আমি বল্‌লাম : আমরা যদি মুসলিম বিজয় থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার ইসলামী ফের্‌ক্বাগুলো সম্পর্কে লিখিত আলফ্রেড বেল এর গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পুনরায় নজর দেই তা হলে একটি স্থানে আমরা দেখতে পাই, তিনি বলেছেন :

"ওহ্বী খাওয়ারিজগণ, যাদের এই নামকরণ ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে ওহব আল–রাসিবীর প্রতি সম্বন্ধিত এবং যাদের বিরুদ্ধে হজরত আলী (রাঃ) নাহরাওয়ান নামক ময়দানে যুদ্ধ করেছিলেন, এরাই হলো আবাজিয়া খাওয়ারিজীর দল।" এদের বিভক্তি সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন: 'মরক্কোর আবাজীয়াদের একটি অংশ ছিল থার্ত নগরে। উত্তর আফ্রিকায় যাদের রুস্তমী রাজত্ব ছিল। এরা ছিল সবচেয়ে কঠোর চরমপন্থী দল এবং তারা আব্দুল ওহ্হাব ইবনে রুস্তমের অনুসারী ছিল, যার নামানুসারে এই ফেরক্বাকে ওহ্হাবিয়্যা নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, সে লোকটি ধর্মের ক্ষেত্রে কাজে ও বিশ্বাসে অনেক পরিবর্তন–পরিবর্ধন সাধন করে। লেখক প্রায় দশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং সকলকে অবহিত করেন যে, এরা

---

(১) দেখুন, উল্লেখিত গ্রন্থের ২য় খণ্ড–৫৫ পৃঃ, এতে আব্দুল ওহ্হাব ও তার সাম্রাজ্য সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

আহ্লে সুন্নাতকে ঘৃণার চোখে দেখে। [১]

এরপর আমি বললাম : উত্তর আফ্রিকার ইতিহাসে আক্বীদাহ ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া দলীল-প্রমাণাদির এই সম্ভারের মাধ্যমে সত্যের অন্বেষণকারীর নিকট লিখকগণ যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। তারা রুস্তুমী-আবাজিয়া খাওয়ারিজ দের মতবাদ নাকচ করে দেন। ওহ্হাবিগণ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাদের জন্মলগ্ন হতেই এই আবা জিয়া রুস্তুমিয়া খাওয়ারিজদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আব্দুল ওহ্হাব ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রুস্তুম এর নামে সম্বন্ধিত করে তাদের এই নামকরণ করা হয়। প্রায় সব গ্রন্থাবলীর দ্বারাই তা প্রমাণিত।

অপরদিকে, শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব যে আন্দোলন শুরু করেন তা ছিল পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত ও নবপ্রবর্তিত কলুষিত বিষয়াদি দূরীভূত ও নিরসন করার এক উদ্দীপ্ত প্রচেষ্টা। এতে আক্বীদাহ বিশুদ্ধ করণ এবং শিরক-বেদ্'আত ও উহার উপকরণাদি থেকে ইসলামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার আগ্রহ ছিল তীব্র। তিনি এই আন্দোলনের কার্যক্রমে ঠিক সেই পন্থাই অবলম্বন করেন যে পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী সংস্কারবাদী উলামাবৃন্দ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: ইরাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, সিরিয়ায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, মিশরে আল্লামা ইজ্জ ইবনে আব্দুস সালাম মরক্কো ও স্পেনে 'ইমাম শাতিবী', ইয়ামনে 'আমীর ছান'আনী' ও অন্যান্য

---

(১) দেখুন, 'উত্তর আফ্রিকার ইসলামী ফেরক্বাগুলো' পৃ: ১৫০।

ইমামগণ। সংস্কার ও নবায়নের এই ইমামগণ ও অন্যান্যরা খাওয়ারিজদের মতবাদ তথা এরা যে সব বেদ্'আত ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতি লোকদের আহ্বান করতো সেইসব বিষয়সমূহের এবং যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী সেগুলোর কঠোর বিরোধী ছিলেন। এই সব রসদ–সম্ভার দল–মত–সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে আছে।

আল্হামদুল্লিাহ, এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণের পর উপস্থিত সবাই আশ্বস্ত হলেন। বিশেষ করে যখন তারা দেখতে পেলেন যে, ওহ্হাবিয়া নামটি বারবার তাদের ইতিহাস ও আক্বীদাহ–বিশ্বাস সম্পর্কিত বই–পুস্তকে উল্লেখিত রয়েছে এবং তাও তাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতির বিশ্লেষণসহ।

কিন্তু আমার ইচ্ছা হলো, এই তথ্যটি তাদের মানস্পটে এমনভাবে বদ্ধমূল করে দেওয়া, যাতে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং যারা এই সম্পর্কে লিখার এবং এর উপর সম্যক অবহিত হতে চায় তারা উপকৃত হতে পারে। অলংকার শাস্ত্রবিদদের ভাষায় প্রচলিত আছে : 'শব্দগঠনে অক্ষরবৃদ্ধির ফলে এর অর্থগত শক্তি বৃদ্ধি পায়'।

আমি বললাম: আপনাদের সম্মতি থাকলে গ্রন্থপুঞ্জীর পরিধি আরো ব্যাপক করে দেখতে পারি যাতে উপরোক্ত বিস্তারিত বর্ণনার পর আমাদের সম্মুখে ঐতিহাসিক আরো অনেক তথ্যের উদ্ঘাটন হয়ে যেতে পারে। এর প্রমাণ: আপনাদের দেশের উলামাবর্গ ও

শাসকগণ শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের উপর আনেক গুরুত্ব প্রদান করছেন। যেহেতু সউদী শাসকপরিবার এই আন্দোলনের প্রচারে বিশেষ ভাবে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং চিঠিপত্র ও প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মুসলিম শাসকবৃন্দের কাছে এই দাওয়াত গ্রহণের আহ্বান জানান। তাদের এই কার্যক্রম ছিল ধর্মীয় আমানত আদায় ও তাবলীগের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী সলফে ছালিহীনদের আদর্শ অনুসরণে আল্লাহ পাকের নির্দেশ কার্যকরী করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

অর্থ: "আর নিশ্চয়ই এই ক্বোরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য অতি সম্মানের বস্তু এবং এই সম্পর্কে শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।" (সূরা যুখরুফ-৪৪)

এসব দেখে মরক্কো তথা পশ্চিম প্রান্তের দেশগুলোর শাসকবর্গ ও উলামাগণ এই আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও তথ্যনির্ভর গবেষণায় মনোযোগ প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে তারা এই আন্দোলনের বিশুদ্ধতার উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ বললেন, কথা ঠিক! আমরা এই সম্পর্কে ফলপ্রসূ, দলীল-ভিত্তিক ও সন্তোষজনক আরো তথ্যাদি জানতে চাই।

আমি বললাম, ইন্‌শা আল্লাহ, আরো জানতে পারবেন।

এর পর আমি বললাম : সম্ভবতঃ আপনাদের জানা আছে, ইমাম সউদ ইবনে আব্দুল আযীয (রহ্ঃ)–সউদী প্রথম সরকারের তৃতীয় ইমাম– ১২১৯ হিঃ সনে মক্কায় প্রবেশের পর উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়া ও মরক্কো সহ বিভিন্ন দেশের রাজা–বাদশাহ্‌গণের কাছে বেশ কয়েকটি পত্র প্রেরণ করেন। এইসব পত্রের মধ্যে তিনি তাওহীদের হক্বীক্বত, তথা দ্বীনের সেইসব মৌলিক নীতিমালার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন যা নিয়ে আগমন করেছিলেন রাসূলে করীম হজরত মোহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এবং যা ছিল পরবর্তীকালে সংযোজিত নবনব বিষয়াদি থেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন এবং যা তিনি সততা ও আমানতের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি সর্বোত্তম সালাম ও ছালাত বর্ষণ করুন। তন্মধ্যে একটি পত্র তিন পৃষ্ঠায় লিখা ছিল, যা একটি জার্মান ম্যাগাজিন 'ইসলামিকা' জার্মানী ভাষায় এর মূল বিষয়বস্তুর উপর জনৈক প্রাচ্যবিদের বিশ্লেষণ সহ ছেপে ছিল। [১]

এই পত্রটি উহার মূল আরবী উদ্ধৃতি ও উহার অন্তর্ভুক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সেই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছিল যার প্রতি ইমাম সউদ ইবনে আব্দুল আযীয এবং এর পূর্বে তাঁর পিতা আব্দুল আযীয কর্তৃক আল্লাহ পাক ও তার রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক দ্বীনের প্রতি আল্লাহর জ্যোতি নিয়ে লোকদের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। যাতে এই আন্দোলন সম্পর্কে মানুষের মন–মগজে যে সব মিথ্যা–অপপ্রচার সংশ্লিষ্ট হয়ে ছিল সেগুলোর নিরসন হয়ে যায়। ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব তাঁর মৃত্যুর পূর্বে (১১১৫–১২০৬ হিঃ) এই সব অপবাদ নাকচ করে যান এবং এগুলোর বিরুদ্ধে

---

(১) দেখুন, উক্ত ম্যাগাজিনের ৭ম খণ্ড ১৯৩৫ সন।

আপন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন :

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

'সুবহানাকা হা–জা বুহতানুন আজীম'

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে বলছি, এগুলো তো গুরুতর মহা অপবাদ।" এর পূর্বে সৃষ্টির সেরা আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরও লোক অনেক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল।

এভাবে তিনি তার বিরোধীপক্ষের এক ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইম ও বাগদাদের বিশিষ্ট আলেম শায়খ আব্দুর রহমান সুওয়াইদী (রহঃ)এর কাছে লিখিত পত্রে এ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। বিশেষ করে, শেষোক্ত আলেমের কাছে লিখিত পত্রে তিনি স্বীয় আক্বীদাহসহ যে সব বিষয় স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন তার মধ্যে ছিল : আল্লাহ তা'আলার এবাদতে এখলাছ, লোকের মধ্যে প্রসারিত বিভিন্ন প্রকার শিরক–যেমন: মৃত ব্যক্তিদের ডাকা, আল্লাহকে ছেড়ে এই মৃতদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এরপর তিনি বলেন : 'এই দাওয়াতের কারনে অনেক লোক আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং আমাদের প্রতি বহু মিথ্যা বিষয় আরোপ করে।' শেষের দিকে তিনি বলেন : আমি আমার অধিনস্তদের নামাজ পড়তে, যাকাত প্রদান করতে এবং অন্যান্য ফরজ বিষয়গুলো আদায় করতে বাধ্য করি। তাদেরকে সুদ, মদ্যপান ও অন্যান্য খারাপ বিষয়গুলো থেকে আমি কঠোর ভাবে বারণ করি। কোন শাসক বা আমীরের পক্ষে এতে আপত্তি বা কটাক্ষ করার কোন সুযোগ দেইনি। কেননা, এসব বিষয় জনসাধারণের কাছে পছন্দনীয়। তাই তাদের আপত্তি ও শত্রুতা

বর্ষিত হয় আমার তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কীয় আদেশ ও নির্দেশের উপর। তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে বলে, 'আমার এই আদেশ ও নিষেধাবলী অধিকাংশ লোকের মতামতের পরিপন্থী।'

এই ভাবে ফেত্না বেড়ে চললো। আমাদের উপর তারা শয়তানবাহিনী লেলিয়ে দিল। তারা আমাদের সম্পর্কে এমন এমন অপবাদ রটালো যা কোন বুদ্ধিমান লোক বর্ণনা করতে লজ্জা বোধ করবে, বানোয়াট বিষয়াদি তো আছেই। তন্মধ্যে আপনারা যা উল্লেখ করেছেন যে, যারা আমার অনুসরণ করবে না তারা কাফের। আর আমি নাকি মনে করি যে, তাদের বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার! কি ভাবে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মস্তিষ্কে এসব কথা প্রবেশ করতে পারে ? কোন মুসলমান বা কোন কাফের বা কোন জ্ঞানী বা পাগল কি এগুলো বলতে পারে ? শায়খ মোহাম্মদ তাঁর প্রতি আরোপিত বহু বিষয়ের উল্লেখ করে পরিশেষে বলেন : মোদ্দা কথা হলো, তাওহীদের প্রতি আহ্বান এবং শিরক থেকে নিষেধ ব্যতিরেকে যে সব বিষয় আমাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তার সবই অপবাদ। এ গুলো অন্যদের বেলায় অস্পষ্ট হলেও আপনাদের বেলায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার। (১)

এরপর আমি তাদের বললাম: মরক্কোর শাসকবর্গ ও সেখানকার উলামাদের অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহের প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি প্রদান করতে পারি ঃ

---

(১) 'আল-বয়ান ওয়াল ইস্হার' রচনায়: শায়খ ফাওযান সাবিক্ব, ১ম সংস্করণ হিঃ ১৩৭২, পৃ: ৮২-৮৪ এবং 'শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব সপ্তাহ' উপলক্ষে ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত 'শায়খ মোহাম্মদের পত্রাবলী' ৫ম খণ্ড।

১– গভীর অধ্যয়নের পর এই আন্দোলনের প্রতি মরক্কোর সুলতানের স্বীকৃতি ও উহার নীতি–মালার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। এই সুলতান হলেন, সেখানকার বর্তমান শাসকপরিবারের পিতামহ সাইয়িদী মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আলভী। তিনি তাঁর দেশে বেদ,আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, যেমন করেছিলেন তদানিন্তন প্রচলিত বিভিন্ন সূফী মতবাদের বিরুদ্ধে। তিনি ইজতেহাদের আহ্বান জানান এবং সুন্নাতের প্রসারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন মুসলিম শাসকবৃন্দের মধ্যে সর্বাধিক প্রতাপশালী। অপরদিকে তাঁর দেশ বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের অগ্নিশিখায় জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। যেমন, বাতেনী উবায়দী মতবাদ, অজ্ঞতার প্রসারসহ বেদ্‌আতপন্থীরা, ওহ্হাবিয়া রস্তুমিয়া খারিজীয়া বাতিনিয়া ইত্যাদি। এর উপর ছিল তখন ইউরোপীয়দের হাতে স্পেন পতনের পর উত্তর আফ্রিকায় ক্রুসেড–যুদ্ধের ভয়াবহতার ছাপ।

মোহাম্মদ জুম,আ তাঁর 'শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের প্রসার' নামক গ্রন্থে সাইয়িদী মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আলাভীর এমন অনেক কার্যকলাপ উল্লেখ করেছেন যা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের সাথে অভিন্নতা প্রকাশ করে। উভয়েই আল্লাহর সাথে শির্ক ও বেদ,আত থেকে একত্ববাদের পরিচ্ছন্নতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। (১)

এই সুলতানের কথাই ফরাসী ঐতিহাসিক 'শারলী জুলিয়ান' তার

---

(১) দেখুন, উক্ত গ্রন্থ, মুদ্রণে: বাদশাহ আব্দুল আযীয ট্রাষ্ট, রিয়াদ।

'উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । মোহাম্মদ গাজালী ও বশীর সালমা উক্ত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করেন। ইতিপূর্বে এর আলোচনা হয়েছে।

অতঃপর আমরা উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তার ভাষ্য পাঠ করি। তিনি বলেন : 'সাইয়্যিদ মোহাম্মাদ ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ও সৎলোক। তিনি হাজীদের মাধ্যমে আরব উপদ্বীপে ওহ্হাবী আন্দোলনের প্রসার ও উহার প্রতি সেখানকার শাসক সউদপরিবারের সহায়তা ও সহানুভূতির ব্যাপারে অবগত হন। আন্দোলনের বক্তব্যে তিনি আবিভূত হন। তাঁর একটি উক্তি বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা বলেছিলেন : 'আমি মাজহাবে মালিকী এবং আক্বীদায় ওহ্হাবী।' তার ধর্মীয় অনুভূতি এমন পর্যায়ে উন্নত ছিল যে, তিনি ঐ সমস্ত বই–পুস্তক ধ্বংস করার অনুমতি প্রদান করেন যেগুলো ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রকাশ করছিল এবং আল আশ্'আরী মতবাদের বৈধতার স্বীকৃতি দিচ্ছিল। এইভাবে তিনি কোন কোন খানক্বাও ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। (১)

২– অপরদিকে মরক্কোর ঐতিহাসিক 'আহমদ আন নাছিরী' তার 'মরক্কোর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আরো ব্যাপক আলোচনা করেছেন। আপনার লাইব্রেরীতে অবশ্যই এই গ্রন্থ মওজুদ থাকবে।

তিনি বললেন : হাঁ, আছে । এই বলে যখন তিনি বইটি উপস্থিত

---

(১) 'উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃ: ৩১১।

করলেন তখন আমি '১২২৬ হিঃ সনের ঘটনাবলী' এর অধ্যায় বের করলাম। সেখানে গ্রন্থকার বলেছেন :

"এই বৎসর একদল মরক্কোবাসী হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে আগমন করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মরক্কোর সুলতান মা–ওলা ইব্রাহীম ইবনে সুলতান মাওলা সুলায়মান, যিনি তাঁর পিতা সাইয়িদী মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলভীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে মাওলা ইব্রাহীম ও তাঁর সফরসঙ্গীরা বলেন :

"আমরা ইবনে সাউদের কাছে এমন কিছু দেখতে পাইনি যা আমাদের জানামতে বাহ্যিক শরীয়তের পরিপন্থী ছিল। আমরা তো তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে দেখলাম, বিশুদ্ধ পন্থায় পাক–পবিত্র হয়ে নামাজ আদায়, রোজা পালন, অসৎ কাজে নিষেধ ও সৎকাজের নির্দেশ এবং হরমাইন শরীফাইনকে অপবিত্রতা ও পাপকাজ থেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে রাখা ইত্যাদি ধর্ম–কর্মে অটল, উদ্যোগী ও সচেষ্ট। (১)

তারপর আমি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলাম:
এমন লোক সম্পর্কে আপনারা কি ধারণা পোষণ করেন যার সম্পর্কে মাওলা ইব্রাহীম ইবনে মাওলা সুলতান সুলায়মান ও তাঁর অনুগামীরা ১২২৬ হি: সনে হজ্জ মওসুমে মক্কায় আলাপ–আলোচনার পর শুভ অভিমত ব্যক্ত করেন। ঐতিহাসিক আহমদ নাছিরী সেই প্রচলিত পদ্ধতির নবী–ক্বাফেলার বর্ণনা দেন, যে ক্বাফেলা অভিনব আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে ফাস নগর থেকে বের

---

(১) 'আল ইস্তেক্বছা লি আখবারিল মাগরিবিল আক্বছা' ৮: ১২০

হতো। রাজা–বাদশাহগণ এই ক্বাফেলার প্রতি অত্যাদিক গুরুত্ব দিতেন এবং এই ক্বাফেলা বিশিষ্ট উলামাবর্গ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী,বিচারক ও একজন ক্বাফেলার নেতা নিয়ে গঠন করা হতো। জাকজমকের দিক দিয়ে এই ক্বাফেলা মিশর ও সিরিয়া থেকে আগত ক্বাফেলা সমুহের সমপর্যায়ের হতো। (১)

ইমাম সউদ ও তাঁর ঘনিষ্ট আলেমগণের সাথে মরক্কোর উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত এই ক্বাফেলার আলাপ–আলোচনার পর তারা কি আব্দুল ওহ্হাব ইবনে রুস্তম আবাজী খারেজীর মতবাদের সাথে একমত হতে পারে ? যে আবাজী ছিল মূলতঃ সেই ওহ্হাবী মতবাদের হোতা যার বিরুদ্ধে ফাত্ওয়া জারী করা হয়েছিল। না, এটা ছিল ইসলামের শত্রুদের পক্ষ হতে আরোপিত একটি জঘণ্য অপবাদ, যা কোন কোন মুসলমান পর্যালোচনা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষা ব্যতিরেকে এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ও নীতি–মালাভিত্তিক বই–পুস্তক ঘাটা–ঘাটি না করেই বিশ্বাস করে ফেলে।

উপস্থিত সবাই বলে উঠলেন: আমরা আপনার সাথে একমত। আমরা সবাই আশ্বস্ত হলাম, তবে আশ্চর্যের ব্যাপার ! কি ভাবে আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিতবর্গ ও গবেষকদের কাছে এই সব তথ্যাবলী গোচরীভূত হলোনা,যেগুলো সন্দেহাতীত ভাবে আমাদের প্রামাণিক বই–পুস্তকগুলোতে সন্নিবেশিত রয়েছে।

আমি আরো বললাম: এই সাথে আরো যোগ করছি এবং এর

---

(১) উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১২১

দ্বারা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হবে আশা করি। তা হলো: উপরোল্লেখিত ঐতিহাসিক আহমদ নাছিরী এই মতবাদ সম্পর্কে তার ইতিহাসে ১০পৃষ্ঠারও অধিক অংশ জুড়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এর আরো কিছু বক্তব্য আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরতে চাই। তিনি আপনাদের নিকট একজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক এবং তার ইতিহাস আপনাদের দেশে গ্রহণযোগ্য অন্যতম গুরুত্বপ‍ূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। উপস্থিত সবাই এতে সায় দিলেন। আমি বললাম :

"ঐতিহাসিক নাছিরী সুলতান সুলায়মান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আলাভী – যার হাতে ১২২৬ হিঃ সনে ফাস শহরে বায়'আত গ্রহণ করা হয় এবং যিনি ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে সউদ ও তাঁর পিতা ইমাম সউদ ইবনে আব্দুল আযীযের সমসাময়িক ছিলেন, যিনি প্রথমবারের মত ১২১৪ হিঃ মোতাবেক ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করেন – সম্পর্কে বলেন যে, তিনি অর্থাৎ সুলতান সুলায়মান ইচ্ছা করলেন, তিনি ইমাম ইবনে সউদ ও তাঁর আন্দোলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ছেলে মাওলা ইব্রাহীমকে মরক্কোর একদল উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমভিব্যাহারে হেজাজে প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে পিতার একখানা জবাবী পত্রও ছিল। মাওলা ইব্রাহীম দলবলসহ হেজাজ পৌছলেন। তারা প্রথমে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করেন এবং পরে মদীনায় পৌছে রওজা শরীফ যিয়ারত করেন। তাদের সব কাজ যথাযথ মর্যাদা সহকারে নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বস্তির মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হয়।

এই সাথে লেখক নাছিরী আরো বলেন: এই বৎসর যারা মাওলা

ইব্রাহীমের সাথে হজ্জব্রত পালনে শরীক হয়েছিলেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা ইমাম সউদ ইবনে আব্দুল আযীযের পক্ষ থেকে এমন কিছু অবলোকন করেননি যা, তাদের জানামতে প্রকাশ্য শরীয়তের পরিপন্থী। বরং তাঁর বা তাঁর অনুসারীদের কাছে তারা দেখতে পেয়েছেন ধর্মের প্রতি দৃঢ় অবস্থান, নামাজ, তহারত, ছিয়াম, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধসহ যাবতীয় ধর্মীয় প্রতীক সমূহের সঠিক প্রতিষ্ঠা, হরমাইন শরীফাইনে পূর্ব থেকে অবাধে প্রচলিত পাপ ও অসমীচিন কার্যাবলীর বিমোচন ইত্যাদি।

এরপর মাওলা ইব্রাহীম যখন হেজাযের আমীর শরীফের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হলেন তখন তাঁর প্রতি রাসূল পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শরীফের পার্শে তার নিকটতম ব্যক্তির সমমর্যাদায় তিনি উপবেশন করেন। উভয়ের মধ্যে আলাপ–আলোচনায় যিনি সাহায্য করেন তিনি হলেন ফক্বীহ কাজী আবু ইসহাক ইব্রাহীম যারয়ী। ইবনে সউদ তাঁদের সাথে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপনকালে এক পর্যায়ে বললেন:

'অনেক লোক মনে করে, আমরা মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম)–এর সুন্নাহ বিরোধী! আপনারা কি এমন কিছু দেখেছেন যা সুন্নাহর পরিপন্থী এবং আমাদের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে যা শুনে এসেছেন তার কতটুকু দেখতে পেলেন?'

কাজী ফক্বীহ তখন বললেন, আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে,

আপনারা আল্লাহর 'সত্তাগত ইস্তেওয়া'র (অর্থাৎ আরশের উপর হওয়ার) মতবাদে বিশ্বাস করেন, যা আল্লাহর স্বীয় সত্তায় সমাসীন ইস্তেওয়াকারীর অর্থাৎ অবস্থানকারীর দৈহিক অস্তিত্ব অনিবার্য করে তুলে। ইবনে সউদ এর উত্তরে বললেন: 'আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এই সম্পর্কে আমরা তো সেকথাই বলি, যা ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন:

" الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، و الإيمان به واجب "

অর্থাৎ 'আল্লাহর (আরশের উপর) সমাসীন হওয়া জানা কথা, তবে এর ধরণ–প্রকৃতি আমাদের জানা নেই; এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা বেদ'আত এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন আমাদের উপর ওয়াজিব।'

বলুন, এর মধ্যে কি সুন্নাতের বিরোধী কোন কথা আছে? তারা বললেন: না, আমরাওতো এরকমই বলি।

এরপর ক্বাজী জারয়ী আমীর ইবনে সউদকে বললেন: আমরা জানতে পেলাম, আপনারা কবরে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর জীবন এবং তাঁর অপর নবীভাইগণের কবর–জীবনও অস্বীকার করেন। নবী(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর কথা শুনামাত্র আমীর ইবনে সউদ শিহরিয়া উঠেন এবং উচ্চস্বরে তাঁর উপর দরূদ পাঠ করেন। এরপর বলেন: আল্লাহর পানাহ চাই, আমরা তো বলি, তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কবরে জীবিত আছেন। তদ্রূপ অপর নবীগণও আপন আপন কবরে জীবিত রয়েছেন, শহীদদের জীবনের চেয়েও উন্নত জীবন নিয়ে।

৩– ঐতিহাসিক আহমদ নাছিরী আলোচনার শেষ পর্যায়ে বলেন: আমি বলি, সুলতান মাওলা সুলায়মান (রহঃ)ও এই অভিমত পোষণ করতেন। এ কারনেই তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করেন, যে প্রবন্ধে তিনি সুফিবাদের বৈরাগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সান্নাতের গণ্ডী থেকে বের হয়ে বেদ'আতের মধ্যে নিমগ্ন হওয়া থেকে সতর্ক করে দেন। সাথে সাথে তিনি ওলী–দরবেশগণের কবর জিয়ারত সংক্রান্ত আদব–কায়দাসমূহ বর্ণনা করে এই ব্যাপারে সাধারণ লোকের বাড়াবাড়ি সম্পর্কেও সতর্ক করে দেন। তিনি এই প্রবন্ধে মুসলমানদের নছিহত করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে যথা যথ প্রতিফল দান করুন।

তিনি আরো বলেন: মাওলা সুলায়মান একটা খুতবানির্দিষ্ট করে নেন, যার মধ্যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং বেদ'আতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। এই খুৎবার কপি প্রত্যেক জামে মসজিদে বিতরণ করেন এবং সেই সাথে সুফীদের খান্‌ক্বাগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেন। (১)

সফরদলের প্রতি সম্বন্ধিত অনেক বিষয়ে আলাপ–আলোচনার কথা উল্লেখ করার পর ঐতিহাসিক নাছিরী বলেন:

'অতঃপর দলের নেতা বললেন: উক্ত দলের সঙ্গীগণ এই সব তথ্য প্রদান করেন। এগুলো সম্মিলিত ভাবে তাদের কাছ থেকে আমি শুনেছি। পরে একজন একজন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা সবাই এইসব বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। (২)

---

(১) 'আল ইস্তেক্বছা' ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১–১২২।
(২) উপরোক্ত গ্রন্থ দেখুন।

এরপর আমি বললাম: এই হলো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা দলীল–প্রমাণ ও বাস্তবভিত্তিক আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি আপনাদের কথা দিয়ে ছিলাম যে, আমি আমার বক্তব্যে আপনাদের পারিপার্শ্বিক গণ্ডী থেকে বের হবো না, যে গণ্ডীর মধ্যে প্রকৃত ওহ্‌হাবী আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। যে কারনে, আপনাদের কাছে এবং অনেক মুসলমান ভাইদের কাছে শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাবের দাওয়াতের হক্বীকত ভ্রান্তির ভেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল এবং যে দাওয়াত সাউদী শাসক পরিবারের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতাও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়েছিল।

অথচ শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব (রহঃ)–এর প্রতি যখন মিথ্যা ও অপবাদের প্রলেপ লাগানো হয় তখন তিনি বিভিন্ন উপায়ে সেগুলোর অসারতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন এবং বার বার তা প্রত্যাখ্যান করে বলতে থাকেন: 'এটা আমার উপর এক বিরাট অপবাদ'।[১] এই প্রসঙ্গে তাঁর যে রেসালাগুলো রিয়াদস্থ ইমাম মোহাম্ম ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সবিস্তারে ছেপেছে, তার কয়েকটি নমুনা আপনাদের সম্মুখে ইতিপূর্বে পেশ করেছি। এগুলোর মধ্যে তিনি ঐসব অপবাদ ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা নাকচ ও অস্বীকার করেন এবং বারবার এ কথাটি বলেন: "এটা এক মহা অপবাদ"।

আশ্চর্যের বিষয়! কি ভাবে একজন বুদ্ধিমান লোক এমন বিষয়াদি

––(১) দেখুন, শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাবের রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, মুদ্রণে: ইমাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। মুলতঃ এই খণ্ডটি পত্রাবলী ও প্রতিক্রিয়ামূলক জবাবসমূহের জন্য নির্দিষ্ট।

সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারে, যা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের জীবনকালে বলা হয়েছে এবং তিনি স্বয়ং এগুলো শুনার পর তা অস্বীকার করেছেন। পরে তাঁর ছাত্ররাও তা অস্বীকার করেছেন। তাঁর গ্রন্থ "কিতাবুত তাওহীদ" ও উহার ব্যাখ্যা "ফাত্হুল মজীদ" ও "তাফ্সীরুল আযীযিল হামীদ" গভীর ভাবে পড়ুন এবং অনুধাবন করুন। এগুলোর মধ্যে যদি এমন কিছু দেখেন যা রাসূল–ল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনিত শরীয়তের পরিপন্থী তা হলে আপনারা সন্দেহ করতে পারেন। এগুলোর মত তাঁর আরো অনেক রিসালা রয়েছে; যেমন– সালাসাতুল উছুল, কাশ্ফুশ সুবুহাত, আল ক্বাওয়াইদুল আরবা', আদাবুল মাশ্ইি ইলাছ ছালাত ইত্যাদি।

(৪) আব্বাস আল জারারী। তিনি এই মরক্কোর অধিবাসী। আমার জানা নেই, আপনারা তাঁর সেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার খবর পেয়েছেন কিনা? তিনি এই বক্তৃতা ১৩৯৯হিঃ সনে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে (বর্তমানে বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়) প্রদান করেছিলেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছিলেন: মরক্কোতে সালাফী ধারার আন্দোলন চৌদ্দশত হিজরীর প্রথম দিকে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। ১৩০০হিঃ সনে সুলতান হাসান মরক্কো জাতির প্রতি এই সম্পর্কে এক বাণী প্রচার করেন। ঐতিহাসিক আহমদ নাছিরীও এই বাণীর ভুয়ষী প্রশংসা করেন।

এরূপ ১১৮৫হিঃ সনে একবার হয়েছিল। মক্কা নগরীর উলামাবৃন্দের

সাথে তর্ক করার উদ্দেশ্যে ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে মোহাম্মদ শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আল হুসাইনকে তৎকালীন মক্কার গভর্ণরের সমীপে প্রেরণ করেন। পবিত্র মক্কা শরীফে তথকালীন উলামাদের মধ্যে ছিলেন– ইয়াহ্ইয়া ইবনে ছালেহ আল হানাফী, আব্দুল ওহ্হাব ইবনে হাসান আত–তুরকী, আব্দুল আযীয ইবনে হিলাল প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। তারা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ–আলোচনা করেন। এই তর্ক–বিতর্কের মাধ্যমে তাদের সম্মুখে এই দাওয়াতের নিষ্কলুষতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আশ্বস্তকর অনেক তথ্যাদি উদঘাটিত হয়ে যায়।

এরপর আমি বললাম: মক্কা শরীফের আলেমগণের মধ্যেও অনেক সংশয়–সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, যেভাবে মরক্কো ও অন্যান্য দেশের উলামাদের মধ্যে হয়েছে। এর পিছনে কার্যকরী ভূমিকায় ছিল মিথ্যা, অপবাদ ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার।

মক্কায় দিতীয়বার ইমাম ইবনে সাউদ প্রবেশ করার পর সেখানে অনেক তর্ক–বিতর্ক ও মক্কাবাসীদের নানাবিধ প্রশ্নের জবাবদিহি চলে। তখন নজদী উলামাদের মধ্যে ছিলেন–শায়খ আব্দুল আযীয হুসাইন, শায়খ হামদ ইবনে নাছির বিন মো'আম্মার প্রমুখ। এই শেষোক্ত আলেম ছিলেন ইমাম সউদের পক্ষ থেকে মক্কা শরীফের ক্বাজী ও মুফ্তী। মক্কা শরীফেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কার উলামাগণ আশ্বস্ত হন। এই উপলক্ষে তারা সবাই এক স্বারকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন, যার মাধ্যমে যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ এবং দাওয়াত সম্পর্কে মিথ্যা ও অপবাদ সমূহের নিরসন হয়। এই স্বারকপত্র পরে একাধিকবার ছাপা হয়েছে।

অতঃপর বাদশাহ আব্দুল আযীযের সময় ১৩৪৩ হিঃ সনে তার মক্কায় প্রবেশের পর এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। অবশেষে তাদের মধ্যে আশ্বস্তি ফিরে আসে এবং শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াত সম্পর্কে তাদের যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ নিরসন করা হয়।

আমি আপনাদের আরো বলছি, মক্কার বিভিন্নস্থানে কবরের উপর তৈরী গম্বুজসমূহ শরীফ আওন রফীকের সময় ধংস করা হয়েছে। কেবল হজরত খাদীজা (রাঃ) এর গম্বুজ ধ্বংস করা হয়নি। তখন চলছিল দ্বিতীয় সউদী রাজত্ব ও বাদশাহ আব্দুল আযীয কর্তৃক পুনরায় তৃতীয় সউদী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়। এই গম্বুজগুলো ধ্বংস করা হয় শায়খ আহমদ ইবনে ঈসার পরামর্শে এবং শরীফ ও মক্কার অনেক আলেমদের সমর্থনে। এতে তাদের স্বস্তি ও সম্মতি প্রমাণিত হয়।[১]

এরপর আমি বললাম: ভাইগণ, যে পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা -

---

(১) দেখুন, ইবনে বাস্‌সাম রচিত 'গত ছয় শতাব্দীর নাজদী উলামাবৃন্দ, ১ম খণ্ড (শায়খ আহমদ আল ঈসার জীবণী)

হলো এবং যতটুকু দলীল–প্রমাণ পাওয়া গেল, তার ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই, সেই ভ্রান্ত ওহ্হাবী মতবাদ উহার সমূহ ত্রুটি–বিচ্যুতি ও কলঙ্কসহ শায়খ মোহাম্ম ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের বিশুদ্ধ সালাফী আন্দোলনের উপর আরোপ করা নির্ঘাত ভুল হয়েছে। আপনাদের বই–পুস্তকে যে ওহ্হাবিয়া সম্পর্কে ফাত্ওয়া জারী করা হয়েছে উহার সাথে শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই বা উভয়ের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতাও নেই। কেননা, পরস্পর বিরোধী দুই ধারা কখনও একত্রিত হয় না।

কারণ, শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ও তাঁর ছাত্রগণ রস্তুমী ওহ্হাবী মতবাদকে ঘৃণা করতেন, যেমন ঘৃণা করেছেন সেই মতবাদকে ইতিপূর্বে আপনাদের উলামাগণ। কেননা, শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলন ছিল খাঁটি সালাফী দাওয়াতের, যা কোন দিক দিয়ে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর পরিপন্থী নয়।

একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, মরক্কোর উলামাগণ এই আন্দোলনভুক্ত উলামা ও আলে–সউদের শাসকবর্গকে দোষমুক্ত রেখেছেন, যেহেতু তারা আল্লাহর দ্বীনকে পূণর্জীবিত করা, মুছে যাওয়া সুন্নাতে রাসূলের নবায়ন এবং বেদ'আত অপসারণের উদ্দেশ্যে এই দাওয়াতের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। যখন মরক্কোর উলামাগণ ১২২৬হিঃ সনে হজ্জের মাওসুমে সাউদী শাসক বর্গের

সাথে কথাবার্তা বলেন এবং মতবিনিময় করেন, তখন তাদের সম্মুখে শায়খ মোহাম্মদ ও তার দ্বীনি সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রতি আরোপিত মিথ্যাচার ও অপবাদসমূহের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এরই ভিত্তিতে আমরা স্পষ্টতঃ দেখতে পাই, দূর মাগরিবের চারজন সুলতান এই আন্দোলনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং আপন অপন এলাকায় উহার প্রচার ও তাবলীগের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহন করেন। এরা হলেন:

১- মাওলা সুলতান-সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আলাভী, যিনি ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদের সমসাময়িক ছিলেন এবং যার হাতে ইমাম সাউদ ইবনে আব্দুল আযীযের পত্র পৌছেছিল।

২- মাওলা সুলতান - সুলায়মান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলাভী, যিনি আপন ছেলে মাওলা ইব্রাহীমকে একদল উলামাবর্গের সাথে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন এবং যিনি ইমাম সউদ ইবনে আব্দুল আযীযের সাথে এবং তার আলেমগণ এখানকার আন্দোলনভুক্ত উলামাদের সাথে বিস্তারিত কথাবার্তা বলেন।

৩- মাওলা সুলতান-ইব্রাহীম সুলায়মান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলাভী, যিনি তাঁর পিতা সুলতান সুলায়মানের পর শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

৪– মাওলা সুলতান– প্রথম হাসান (১৩০০হিঃ), তাঁর সময়কাল ছিল দ্বিতীয় সউদী রাজত্ব এবং সে রাজত্বের তৃতীয় পর্বের মধ্যবর্তী সময়। বাদশাহ আব্দুল আযীয সে রাজত্ব ৫ই শওয়াল ১৩১৯হিঃ থেকে কায়েম করেন।

এভাবে ডঃ তক্বীউদ্দীন হিলালী (রহঃ) এই আন্দোলনের প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন হাসান বংশীয় মরক্কোর শাসক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে তিনি তীজানী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এরপর যখন শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াত সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন থেকেই যেখানে তিনি গমন করেছেন সেখানে এই দাওয়াত প্রচারে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেন। শেষ বয়সে তিনি মরক্কোর ফাস নগরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অতঃপর তিনি দারুল বায়জা (কাসাব্লাঙ্কা) শহরে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডঃ শায়খ তক্বীউদ্দীন হিলালী তীজানী মতবাদ ও উহার বাতুলতার উপর একটি বই লিখেছেন। তার মত শায়খ আব্দুর রাহমান আফ্রিকীও, যিনি সেনেগালী তিজানী ছিলেন, উক্ত মতবাদ পরিত্যাগ করেন এবং তীজানীদের মৌলিক আক্বীদাহর নিন্দে করে একটি বই রচনা করেন।

এই ভাবে সেদিন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মরক্কো দেশে

সালাফী মতবাদ ও উহার প্রচার এবং হেজাজ ও নজদের আলে–মগণের প্রতি সেখানকার শাসকবৃন্দ ও সেতৃস্থানীয় লোকদের আকর্ষণ ও মনোযোগ সম্পর্কে বহু লিখালিখির মাধ্যমে পরীক্ষা–নিরীক্ষা জারী থাকে। আল–ওয়াতারীর পুস্তকের প্রতিপাদনকারী উস্তাদ আহমদ আল আম্মারী এর উত্তরে বলেন: সালাফী মতবাদের প্রতি বৈরী আচরণ সূফী মতবাদের পক্ষে জোরালো সমর্থনের ইঙ্গিত বহন করে এবং তা সালাফী পন্থীদের জন্য দারুণ ক্ষতিকর। উপরোক্ত প্রতিপাদন কারী অবশ্য মরক্কোবাসী ছিলেন।

পরিশেষে আমি বললাম: আশা করি এ পর্যন্ত আপনাদের সম্মুখে যা উপস্থাপন করেছি তা বিষয়টি অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট ও সন্তোষজনক। আর যদি আপনারা এর চেয়ে অধিক ব্যাখ্যা দাবী করেন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, যদি উহা মুসলিম বিশ্বের উলামাদের অভিমত বর্ণনা অথবা পাশ্চাত্য দেশের প্রাচ্যবিদদের পর্যালোচনাভিত্তিক অভিমত বিশ্লেষণের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। এই প্রাচ্যবিদরা সময় সময় বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে এবং আন্দোলনের চলমান অবস্থা লক্ষ্য করে। তবে এইগুলোর সমর্থনে অনেক গ্রন্থরাজির প্রয়োজন হবে যা এখানে নাও পাওয়া যেতে পারে।

এজন্য আমি আমার বক্তব্য মরক্কোর উলামা ও মাশায়েখবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। যাতে এই লাইব্রেরী থেকেই প্রামাণ্য

গ্রন্থসমূহ উপস্থাপন করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। আর এটা হবে পরিতুষ্টির জন্য নিকটতম উপায়। যেমন, হজরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন: 'মানুষ যা জানে তার দ্বারাই তাদের সম্বোধন কর। যাতে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি কেউ মিথ্যার অপবাদ না দিতে পারে।'

আমাদের মেযবান অধ্যাপক সাহেব বললেন, আপনি যা বলেছেন তা বাস্তব ও সন্তোষজনক। আলহাম্‌দু লিল্লাহ! যে সব সংশয়–সন্দেহ উত্থাপন করা হত সেগুলোর অবসান হয়ে গেছে। উপস্থিত ভাইদের কী অভিমত? উত্তরে তারা সবাই বললেন, আপনার অভিমত সত্য। সাথে সাথে তাদের একজন বলে উঠলেন: আশ্চর্য্যের বিষয়! এতসব সন্তোষজনক উত্তর ও সহজলভ্য প্রমাণ্য গ্রন্থাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি কি ভাবে এর আগে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেনি।

আমি তাকে বললাম, আপনাদের কাছে তার এই জবাব: আল্লাহ পাকের কাছে একজন শিক্ষার্থী বা আলেমে দ্বীনের দায়িত্ব অনেক বড়, তিনি অজ্ঞ লোকের সমান হতে পারেন না যে, তার প্রতি কোন নির্দেশ প্রদান করা হবে, আর তিনি তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিবেন। বস্তুতঃ একজন শিক্ষার্থী কোন ব্যাপারেই বিনা অনুসন্ধান–গবেষণায় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সাধারণ লোক বা অর্ধশিক্ষিত লোকের ওজর থাকতে পারে, কিন্তু কোন শিক্ষার্থী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষকের বেলায় কোন ওজর খওয়াহী গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তারা হলেন অন্যের জন্য পথ প্রদর্শক ও আদর্শ। ছাত্ররা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাদের দিক-নির্দেশণা ও ধ্যান-ধারণা থেকে সংশয়-সন্দেহ দূরীকরণের পথ-নির্দেশ আশা করবে।

তিনি আমাকে বললেন, আপনি কি এই বিষয়ে সাপ্তাহিক 'নূর' পত্রিকায় -যেটি মরক্কোর তাত্ওয়ান শহর থেকে বের হয়- একটি প্রবন্ধ লিখতে পারেন? আমি বললাম, হাঁ, লিখা যায়। এরপর আমি সউদী আরব ফিরে এসে প্রামাণ্য গ্রন্থাদির দ্বারা প্রতিপাদিত একটি প্রবন্ধ তাদের পত্রিকার জন্য প্রেরণ করি।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর "ওহ্হাবী আন্দোলন" সম্পর্কে লিখার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমার কাছে ইতিবাচক-নেতিবাচক অনেক চিঠিপত্র পৌঁছে। যাদের সাথে মরক্কোতে আমার কথা হয়েছিল তারা এই প্রবন্ধের কলেবর আরো ব্যাপক করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। যাতে এর মধ্যে আরো বেশী তথ্য সন্নিবেশিত করে সেখান থেকে বই আকারে এটি ছাপানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আমি তাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে প্রবন্ধটি বর্দ্ধিত আকারে লিখার কাজটি আল্লাহর রহমতে সম্পন্ন করি। প্রবন্ধটি অতি দীর্ঘায়িত না করার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছি। সাথে সাথে বিভিন্ন উৎসগ্রন্থের প্রতি

ঈঙ্গিত প্রদান করেছি, যাতে আরো বেশী জানার আগ্রহী ও ব্যাপক জ্ঞান আহরণে আকাঙ্খী পাঠক সহজভাবে স্বীয় স্পৃহা নিবারণে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ সমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

এই প্রবন্ধটি বই আকারে সর্বপ্রথম মরক্কোর তাত্‌ওয়ান শহরে হিঃ ১৪০৭ সনে ছাপা হয়। এর কয়েক বছর পর হিঃ ১৪১৩ সনে রিয়াদে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বইটির দ্বারা বিরাট উপকার সাধিত হয়।

এর কারন, ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী ও বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল (আল্লাহ পাক এদের অমঙ্গল থেকে আমাদের রক্ষা করুন) রুস্তুমী ওহ্হাবী মতবাদে আগাম তৈরী (রেডী মেইড) একটা লেবাস পেয়ে যায়, যা তারা আন্দোলন ও উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে বিশুদ্ধ সালাফী এই আন্দোলনের গায়ে পরিয়ে দেয়। তাদের ভয় ছিল, এই বিশুদ্ধ আন্দোলনের ফলে তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তারা তো খাদ্য বিতরণকারীদের পিছনে ক্ষুধার্তদের মত মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেগে থাকতো। যেমন, এতিমদের অবস্থা লোকদের ভোজ অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। তাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হলো: মুসলমানদের ভিতর ঘৃণা–বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা। যাতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের প্রসার হয় এবং মুসলিম সমাজে সংশয়–সন্দেহের বীজ ব্যাপক ভাবে বপণ করা হয়।

আল্লাহর অশেষ প্রশংসা, এই পুস্তকের দ্বারা বিশেষ করে দ্বিতীয়বার মুদ্রণের পর বহু উপকার সাধিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো: একাধিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব আমাকে অবহিত করেছেন যে, বর্তমানে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সাবেক কমিউনিষ্ট সোভি–য়েট রাশিয়ার অনেক প্রজাতন্ত্রে তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেখানে একটি ফত্ওয়া প্রচারিত হয়। স্থানীয় লোকজনের ধর্মীয় আবেগ এবং সঠিক ধর্ম–বিশ্বাস ও ইসলামী জ্ঞানে তাদের অপরিপক্কতার সুযোগ নিয়ে উক্ত ফত্ওয়ার প্রবক্তাগণ বলেন: 'একশত ইয়াহুদী হত্যার করার চেয়ে একজন ওহ্হাবী হত্যা করা অধিকতর শ্রেয়।'এর ফলে, সেখানে একজন সালাফী আক্বীদাহর লোক কোন সঙ্গী ছাড়া একা চলাফেরা করতে পারতো না।

অবশেষে, তাদের কয়েকজন লোক সেখানকার উলামা ও ইমামদের সাথে বৈঠকে বসেন এবং তাদের সম্মুখে রস্তুমী ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কে মতবিনিময় করেন এবং শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের হক্বীক্বত ব্যাখ্যা করেন। ফলে, স্থানীয় লোকদের থেকে সালাফী সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সংশয়–সন্দেহের নিরসন হয় এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ ধ্যান–ধারণর উন্মেষ সাধিত হয়। ইতিমধ্যে স্থানীয় কয়েকটি ভাষায় বইটির অনুবাদ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাক এর দ্বারা বহু উপকার সাধন করেছেন।

প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুসলমানের জেনে রাখতে হবে যে, ইসলামের শত্রুরা মুসলমান সমাজে সংশয়–সন্দেহ ছড়ানোর ক্ষেত্রে কখনও

বসে থাকেনা। তার উচিত, জ্ঞান, শিক্ষা এবং আল্লাহর দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়াদি উহার মূল নীতিদ্বয় কোরআন ও সুন্নাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া। যেহেতু এ দুটি বিষয়ই হলো মুসলমানদের সেই অস্ত্র যদ্বারা সে শত্রুর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও বিষ–বাষ্পের মোকাবেলা করতে পারে। প্রিয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওছিয়তস্বরূপ বলেছিলেন:

وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ابداً كتاب الله و سنة نبيه .

অর্থ: "আমি তোমাদের মধ্যে এমন (দুটি) বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা বিভ্রান্ত হবেনা তা হলো: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।" [১]

যারা এই সালাফী আন্দোলন গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও সেই সম্পর্কে গবেষণা করেছে তাদের কাছে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে:

১– ওহ্হাবী আন্দোলন কোন সংগঠিত দল নয়। এটা হলো, আল্লাহর দ্বীনকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ও এই উম্মতের নেক লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণে নবায়ন করার আন্দোলন।

২– এই আন্দোলন নূতন কোন মজহাব নয়, যা সুপরিচিত ফেক্হী মাজহাবগুলোর অনুসারীদের বিরোধিতা করে।

---

(১) দেখুন, বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণ।

৩– শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) সালাফী আক্বীদাহর সঠিক ধারক–বাহক লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা যুগে যুগে দেশে দেশে সল্‌ফে ছালেহীনদের পথে, আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং তারই জন্য নিষ্ঠার সাথে এবাদত কায়েম করার লক্ষ্যে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

৪– ধর্মীয় শাখা–প্রশাখায় শায়খ মোহাম্মদ ছিলেন হাম্বালী মাজহাবের অনুসারী। যেমন, হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাজহাবের অনেক লোক সালাফী আক্বীদায় বিশ্বাসী রয়েছে ।

উপরোক্ত এই আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে জানা গেল যে, মরক্কোর জনৈক মাওলা সুলতান, যার নাম হলো সাইয়্যিদ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–আলাভী, স্বীয় মতবাদ সম্পর্কে বলতেন: 'আমি আক্বীদায় ওহ্হাবী এবং মাজহাবে মালেকী'।[১] এর দ্বারা তিনি রুস্তুমী ওহ্হাবী আবাজিয়া মতবাদের কথা বুঝাননি; বরং তিনি এর দ্বারা যারা খালেছ তাওহীদের আহ্বানকে এই নামে আখ্যায়িত করছে তাদেরকে কটাক্ষ করেছেন ।

পারস্যবাসী শায়খ ইমরান ইবনে রেজওয়ানও এরূপ উক্তি করেছিলেন। তিনি পারস্য উপসাগরের পূর্বসীমান্তবর্তী ইরানের লাঞ্জা

---

(১) দেখুন, শারলী জুলিয়ান রচিত 'উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস', অনুবাদ: মোহাম্মদ মাযালী ও বশীর সালামা, ২:৩১১।

শহরের বিশিষ্ট একজন আলেম ছিলেন। মাজহাবে তিনি ছিলেন হানাফী। কারো মতে তিনি ছিলেন শাফে'য়ী। যখন শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াত তার কাছে পৌছে তখন তিনি বলেছিলেন: 'আমিও একজন ওহ্হাবী।' এই বলে তিনি একটি কবিতাগুচ্ছের মাধ্যমে এই আন্দোলনের প্রশংসা করেন। কবিতার একটি পংতি হলো:–

إن كان تابع أحمد متوهّباً　　فأنا المقرّ بأنني وهابيّ

অর্থ: "আহমাদ (মোহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারীকে যদি ওহ্হাবী নামে আখ্যায়িত করা হয় তা হলে আমি ঘোষণা করছি যে, আমিও একজন ওহ্হাবী"।

এভাবে ইয়ামনস্থ সানা নগরের শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, যিনি একজন সর্বজনমান্য আলেম ছিলেন, যদিও ফেক্বহী মাজহাবে তিনি যায়দী ছিলেন, তিনি শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের মতবাদ অধ্যয়ন করেন এবং উহা পছন্দও করেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় শায়খ মোহাম্মদ ও তাঁর আন্দোলনের ভূয়যী প্রশংসা করেন। উক্ত কবিতার প্রথম লাইনটি হলো:–

سلام على نجد ومن حلّ في نجد　　وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي

অর্থ: " নাজদ ও নাজদবাসীর প্রতি আমার সালাম, যদিও দূর থেকে এই সালাম কোন কাজে নাও আসতে পারে।"

ইয়ামনের প্রসিদ্ধ ইমাম শাওকানীও এই আন্দোলন কে সমর্থন ও উহার প্রশংসা করেন।[১]

ডঃ শায়খ মোহাম্মদ তাক্বীউদ্দীন হিলালী, যার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মরক্কোর একজন বিশিষ্ট আলেম ও বাদশাহ হাসান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াত সম্পর্কে একটি কবিতায় বলেন:

نسبوا إلى الوهاب خير عبادة   فيا حبذا نسبي إلى الوهابيّ

অর্থ: "প্রতিপক্ষরা ওহ্হাবের প্রতি সর্বোত্তম এবাদত সম্বন্ধিত করেছে। ওহ্হাবী বলে আমার সম্বন্ধ কতইনা প্রশংসনীয়।" ('ওহ্হাব' শব্দটি আল্লাহপাকের গুণবাচক একটা নাম)

'ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির সংশোধন' শিরোনামে এই পুস্তিকাটি রচনায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। পাঠকের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত করেছি। কেননা, বর্তমান যুগে দীর্ঘায়িত রচনাবলী কেবল বিশেষ বিশেষ লোকগণই পাঠ করে থাকেন। আশা করি, সন্দেহ নিরসনে আশানুরূপ উপকার লাভ হবে। ইসলামের শত্রুরা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টিকারী ও চিন্তাধারায় গোলযোগ ও তাদের ক্ষতি সাধনে আগ্রহীদের কর্তৃক সৃষ্ট ধুম্রজাল অপসারনে বইটি বিশেষ কার্যকরী ভুমিকা পালন করবে। আমার দৃঢ়

---

(১) দেখুন, শায়খ ইবনে সাহ্মান রচিত আদ দুরারুস সানিয়্যাহ, এতে কবিতাটিও আছে; এবং ডঃ আব্দুল্লাহ প্রণীত– আদাবুদ দা'ওয়া ফী জানুবিল জাযিরাহ ।

বিশ্বাস, এরদ্বারা আল্লাহ পাক অনেক লোকের ধ্যান-ধারণ ও চিন্তাধারা বিশুদ্ধ ও তাদের মন-মস্তিষ্ক আলোকিত করবেন। আল্লাহ পাক স্বীয় নির্দেশ বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ সামর্থ্যবান। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।

ডঃ মোহাম্মাদ ইবনে সা'দ আল শুয়াইয়ির

সংস্কারধর্মী ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিরসন

অবতারণিকা

"মানুষ তার অজানা বিষয়কে শত্রু মনে করে" প্রচলিত এই প্রবাদ অনুসারে কোন কোন মানুষ তার প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিস্বার্থের পরিপন্থী যেকোন বিষয়কেও শত্রু বলে গণ্য করে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কোন অভিমত বা নির্দেশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির প্রতি চূড়ান্ত বিধান হলো, বিষয়গুলো শরীয়তের সেই ঐশী উৎসদ্বয়ের মানদণ্ডে যাচাই করা, যার মধ্যে ভ্রান্তি বা সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

প্রতিটি পর্যায়ে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, তারা যেন ধর্মবিশ্বাস তথা ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট অভিমত গ্রহণ বা আলোচনা-সমালোচনার সময় তাদের ধর্মীয় প্রতিটি বিধান প্রবর্তনের দুই মহান উৎস আল্লাহর কিতাব ও তার নবী মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

কোন ব্যক্তি উপরোক্ত দুই উৎসের পরিপন্থী কোন বিষয় পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং যে ব্যক্তি কথা ও কাজের মাধ্যমে এ দুটি উৎস অনুসারে

চলবে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে। একজন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে যে নীতি-মালার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ওয়াজিব, সেই বিষয়ে তার প্রতি এই বিধান। এটিই হবে তার সজাগ দৃষ্টি, সঠিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণশক্তি এবং নিশ্চিত পন্থা গ্রহণে স্বচ্ছ মানসিকতার পরিচায়ক। ফলে, কখনও সে কারো এমন তাবেদার হয়ে উঠে না, যে শুধু অন্যের প্রতিধ্বনি করে থাকে এবং তার অজ্ঞাতে ইসলামের শত্রুগণ তা থেকে সুযোগ গ্রহণে ইতস্ততঃ করে না।

এখানে মদীনার বনী মুস্তালিক গোত্রের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। ঘটনা সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে এবং অহরহ তা তিলাওয়াত করা হচ্ছে।

আল্লাহপাক বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তা হলে তা তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে তোমরা নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (আল-হুজুরাত-৬)

এই ঘটনার মধ্যে আপন ধর্ম সম্পর্কে ও অপর ঈমানদার ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে সজাগ-সতর্ক মুমেনদলের এই শিক্ষা রয়েছে যে, তারা যেন এমন প্রতিটি সংবাদ ও গুজব অবশ্যই যাচাই-বাছাই করে, যার মধ্যে দলীয় কোন্দল, সমাজে ভাঙ্গন, বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি এবং বিভক্তিজনিত দুরভিসন্ধির গন্ধ পাওয়া যায়।

এমন অনেক শত্রু আছে, যারা অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে মুসলমানদের ধোকা দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন ধারায় ও ক্ষেত্রে অবহেলিত ও অপমানিত করার, যাতে তারা মুসলমানগণকে ইসলামের হাক্বীকত ও উহার বিশুদ্ধ উপাদান থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে। এই সাথে তারা চায় মুসলমানদের জীবনে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের এমন কিছু বিষয়াদির অনুপ্রবেশ ঘটাতে, যা প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আসমানী ধর্মের মূল কাঠামোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ বিপুল ক্ষতি সাধন করেছিল। ইসলামের শত্রুরা এই বিষয়গুলো মুসলমানদের সারিতে তাদের তাবেদার কিছু সংখ্যক আলেম ও সাধারণ লোকদের মাধ্যমে বহুলভাবে প্রচলিত করার বিরতিহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এইসব চক্রান্তের পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা যেন তাদের মত আল্লাহর নাফরমানী ও তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে যায়। যাতে মুসলিম সমাজে তাদের অনুপ্রবেশ ও প্রভাববিস্তার সহজ হয়ে উঠে এবং পরবর্তীতে তারা এই পন্থায় ইসলামের

মধ্যে এমন বিষয়াদির প্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হতে পারে, যা প্রকৃত ধর্ম থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে নেয়। এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার এবং ধর্মীয় বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান না করার ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এমন ভাবে বৃদ্ধি পাবে, যে তাদের জীবনে প্রকৃত ইসলাম এক অপরিচিত বিষয় হিসেবে পরিলক্ষিত হবে।

ইমাম সুফইয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (হিঃ৯৭-১৬১) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি একদা বলেছিলেন: "মুসলিম কোন আলেম বিনষ্ট হলে তার মধ্যে ইয়াহুদীদের সাথে সাদৃশ্যপনা পরিলক্ষিত হবে, যারা ঈমান থাকা সত্ত্বেও স্বীয় জানা মতে আমল করেনা এবং কোন খাঁটি মুসলিম বান্দাহ বিনষ্ট হলে তার মধ্যে খৃীষ্টানদের সাথে সাদৃশ্যপনা পরিলক্ষিত হবে, যারা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির উপর এবাদত করে থাকে।"(১) আমরা আল্লাহপাকের কাছে এগুলো থেকে নিরাপত্তা ও সুস্থ্যতা কামনা করি।

এরই মাঝে ইসলাম আক্বীদাহ ও ব্যবহারিক বিধি প্রবর্তনে তার স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতা পেশ করে। এই পরিচ্ছন্নতা কথা, কাজ ও ধর্মবিশ্বাসে মধ্যমপন্থী এবং আল্লাহ পাকের সাথে চূড়ান্ত সম্পর্ক স্থাপনকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মতকে প্রতিটি বিষয়ে অন্য সব উম্মতের মধ্যে মধ্যমপন্থী হিসেবে আবির্ভূত করেছেন।

---

(১) কেউ কেউ এই উক্তিটি ইমাম সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) এর প্রতি আরোপ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

অর্থঃ "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।" (১)

সুতরাং মুসলিম উম্মত খৃীষ্টানদের বৈরাগ্যতা ও ঈসা (আলাইহিস সালাম)সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসগত অতিরঞ্জন এবং ইয়াহুদীদের চক্রান্ত, মিথ্যাচার ও অপবাদ এর মধ্যবর্তী পর্যায় অবস্থান গ্রহণ করে। খৃীষ্টানরা বৈরাগ্যতাসহ হজরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস, অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির উপর ইবাদত এবং না বুঝে ও বিনাদ্বিধায় পাদ্রীদের অনুসরণে তারা বাড়াবাড়ি করে সীমা লংঘন করছে। আর ইয়াহুদীরা লিপ্ত রয়েছে বিভিন্ন চক্রান্ত, মিথ্যাচার এবং আল্লাহপাক ও তাঁর নবী-রাসূলগণের উপর নিজেদের ভাষায় নানা প্রকার বক্তব্য ও অপবাদ রচনার মধ্যে। তারা ইচ্ছে করে নিজেরা বিভ্রান্ত হয় এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহর জমীনে ফেত্না সৃষ্টি ও বিরোধিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম-বিশ্বাস,

(১) সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৪৩; এই সাথে দেখুন, তাফসীরে জিলালুল ক্বোরআনে 'মধ্যমপন্থার মর্মার্থ' সম্পর্কিত সাইয়্যিদ কুতুবের ব্যাখ্যা।

তথ্য-জ্ঞান ও সত্যবাণীসমূহ গোপন করে রেখেছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আব্বাসী খেলাফতের সমাপ্তি যুগে মুসলিম সমাজে অজ্ঞতার বন্যা তখনই দেখা দেয়, যখন মুসলিম সমাজে বিভিন্ন দিক থেকে অনারবদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে, জ্ঞানচর্চা কমে যায় এবং বহু মুসলমান রোমান দর্শন এবং পারস্য ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত যুগে বা তার পূর্বে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। ফলে, বিভিন্ন মতবাদ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত পরস্পর বিরোধী অনেক দল ও আদর্শের আবির্ভাব ঘটে। এর প্রথম বীজ বপন করে কুখ্যাত ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। সে কপটতার আশ্রয়ে মুসলমানের বেশ ধরে সম্মানিত খলিফা উছমান (রাজিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বিষবাষ্প ছড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।

এই আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বেই 'সাবাইয়া' নামে মুসলিম সমাজে সর্বপ্রথম দল বা ফের্‌কার আবির্ভাব ঘটে। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নিজেই এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিল।

এ জাতীয় দল বা ফের্‌কা সম্পর্কে যেসব বই-পুস্তকে আলোকপাত করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শাহরিস্তানীর রচিত 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল', ইবনে হযমের 'আল্‌-ফাছল ফিল্‌ আহওয়া

ওয়াল মিলাল ওয়ান নিহাল' এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন ফাত্ওয়া ও রচনাবলী। এই সমস্ত গ্রন্থে উক্ত ফের্কাগুলোর বিশ্বাস, এগুলোর জন্মের প্রেক্ষাপট এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থী তাদের নীতিমালা বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই দলগুলোর কোন কোনটির জবাব প্রদানে, তাদের মতবাদ, চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন ও প্রতিবাদে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঐ সময় থেকে মুসলিম বিশ্বে আবির্ভূত বিশ্বাসগত দল ও সংগঠণগুলোর পর্যালোচনা যারা করবে, তারা ভাল করেই আঁচ করতে পারবে যে, মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতি ও আক্বীদাহগত সংঘাত শুরু হয় ইউনানী দর্শন, ভারত-পারস্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সম্পর্কিত হওয়ার পর থেকেই।

মুসলিম সমাজে কখনও এমন ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি বিরাজ করেনি, যারা বহিরাগত ঐসব চিন্তাধারা ও তৎসম্বলিত ইসলামের পরিচ্ছন্ন সঠিক ধর্ম বিশ্বাসে অনুপ্রবেশকারী বিকৃত মতামতগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে আপন আপন পরিবেশকে এগুলো থেকে সংরক্ষণ করতে সচেতন ও সচেষ্ট থাকেন। কেননা, পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতি ও সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে চায় যে, তারা সমর্থ হলে

মুসলমানদেরকে তাদের সঠিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে দিবে।

আল্লাহ পাক এই সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

অর্থঃ "তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।" (সূরা বাক্বারা- ২১৭)

বাতিলের সাথে সত্যের সংঘাতে নিহিত রয়েছে আল্লাহর বিশেষ হেকমত, যাতে মানুষের মন-মস্তিষ্ক সঠিক পথের অনুসন্ধান করে এবং অন্তরাত্মা তা উপলব্ধি করে। ফলে, আল্লাহ যার মঙ্গল চান সে সঠিক পথেরই অনুসারী হয়। কেননা, যুক্তিগত ও উদ্ধৃতিগত উভয় প্রকার প্রমাণাদির মাধ্যমে সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকাশিত।

এটি হলো, ধর্মীয় দাওয়াত ও সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের অংশ বিশেষ। বনী ইসরাইলগণ এই দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদ্বেষ ও অহঙ্কার বশতঃ তা পরিত্যাগ করে। সুতরাং আল্লাহর শাস্তিও আজাব হতে ভীত বিজ্ঞ-বিদ্বান মুসলিম আলেমগণের কর্তব্যঃ আকিদাহ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে মুহম্মদী পথের দিকে লোকদের আহবান করা এবং তাদের আকীদাহগত ধ্যান-ধারণাকে পরিশুদ্ধ করা। আর এই দায়িত্বটি ঠিক সেইভাবে পালন করতে হবে

যেভাবে আল্লাহপাক তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং যার প্রতি তাঁর রাসূল আহবান করেছেন। অতঃপর সেই পথের পথিক হলেন নবীর সম্মানিত সাহাবীগণ ও তাঁদের পরবর্তী কার্যকরীভাবে সঠিক অনুসারীগণ।

যুগে যুগে ও দেশে দেশে বিশুদ্ধ ও সঠিক দাওয়াতের বিরোধী লোক ও শত্রুপক্ষের কখনও অভাব হয়নি। এই শত্রুতা বা বিরোধিতা অজ্ঞতা, ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য বা ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তী হয়েই করা হয়। প্রবৃত্তি মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। এগুলোই ঐসব শত্রুদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও গোপনে অস্ত্র ধারণে প্ররোচিত করে। ফলে, তারা নিরপেক্ষ ও সঠিক আহবানকারীদের উপর বিভিন্ন অভিযোগ আরোপ করে এবং তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও অপবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। উপরন্তু তারা নিষ্ঠাবান আলেমগণ থেকে লোকজনের আস্থা হারানোর জন্য তাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার ঘৃণ্য ও নোংরা উপাধি আরোপ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। যাতে অধিকাংশ লোকের নিকট ব্যাপারটি রহস্যের অন্ধকারেই থেকে যায়। এরা হলো সেই সাধারণ লোক যারা না পড়াশুনা করে, না যাচাই-বাছাই করে সত্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন মনে করে।

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপের মধ্যস্থল থেকে শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের

সংস্কারমূলক বিশুদ্ধ দাওয়াতের এমন এক সময় আবির্ভাব ঘটে যখন মুসলমানগণ শুধু আরব উপদ্বীপে নয় বরং প্রতিটি দেশে এ ধরনের একটি আন্দোলনের প্রত্যাশায় ছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল সনাতন অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হওয়া, আক্বীদাহ, ইবাদত তথা যাবতীয় ধর্মীয় বিষয়ের সংস্কার সাধন করা এবং অনভিজ্ঞ উলামাদের অনুসরণ ও প্রভাব থেকে বিমুক্ত হওয়া। সত্যের প্রতীক রাসূলে করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই সব ভ্রান্ত উলামাদের সম্পর্কে উম্মতের প্রতি আপন উদ্বেগ ব্যক্ত করে গেছেন, যারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ দলিল ব্যতীরেকে ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমে লোকদের বিভ্রান্ত করে এবং নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়। রাসূল(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

« إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم فيَضلون و يُضلون »

অর্থ:"আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ইলম দান করার পর সেই ইলম সরাসরি এমনিই উঠিয়ে নিবেন না, বরং তিনি ইলমসহ উলামাদের উঠিয়ে নিবেন। তখন থাকবে শুধু অজ্ঞ লোকগণ, তাদেরকে ফাত্ওয়া জিজ্ঞেস করা হলে তারা নিজেদের মতানুসারে ফাত্ওয়া প্রদান করবে; ফলে, তারা নিজেরা ভ্রান্ত হবে এবং অপরকেও ভ্রান্ত করবে।"

(হাদীছটি ইমাম বোখারী উরওয়া ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাজিয়াল্লাহু আনহুমা)হতে বর্ণনা করেছেন)

এহেন প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আভির্ভূত হলো শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের এই দাওয়াত অর্থাৎ সংস্কারমূলক আহ্বান। উদ্দেশ্য হলোঃ ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত অনৈসলামী বিষয়গুলোর অপসারণ, তাওহীদ বিশেষ করে আল্লাহপাকের ইবাদত ও তার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির অংশীদারীত্ব, কর্ম ও বিশ্বাসে আল্লাহপাকের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উহার অপব্যবহার এবং আল্লাহপাকের নাম ও গুণাবলী অস্বীকার করে কুরআন ও হাদীছের কোন প্রমাণ ব্যতীরেকে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ জনিত ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন।

ফলে, তিন প্রকার তাওহীদ (রাবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ এবং নাম ও গুণাবলী)-এর কোন ক্ষেত্রেই তখন নির্মল থাকতে পারেনি। বিশ্বাস ও আমলের দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে এমন অনেক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যা উহাকে প্রকৃত অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কারণ, উহা হযরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত জীবন পদ্ধতির আওতা বহির্ভূত অনেক বিষয়াদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এরপর পালা আসে ঐসব বিষয় প্রচারকারীদের কথাবার্তা ও মনমুগ্ধকর প্রদর্শনীর আকর্ষণে সাধারণ লোকদের অনুসরণ ও অনুকরণ।

এ জাতীয় লোক সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ

الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অর্থঃ মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, পার্থিব জীবনে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে এবং তার অন্তরে যা আছে উহার উপর সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে, সে কিন্তু কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শষ্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। আল্লাহতো অশান্তি পছন্দ করেন না।" (সূরা বাক্বারা- ২০৪ ও ২০৫)

এর প্রকৃত কারণ হলোঃ মুসলমানদের অন্তরাত্মা তাদের দৃঢ় ভিত হতে বিচ্যুত হওয়া। আর সেই ভিত হলোঃ সৃষ্টির জন্য আল্লাহর প্রবর্তিত শরীয়াত এবং মানব সৃষ্টির হেকমত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধি। এই বিচ্যুতির ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা, অনুধাবন ও উপলব্ধির দৈন্যতা এবং প্রভাবশালী ও বিজয়ী জাতির অন্ধ অনুকরণ; জন্ম নেয় বিভিন্ন প্রকার সুফী মতবাদ, যার সূত্রপাত ধর্মীয় আগ্রহ-আকর্ষন, একাগ্রতা ও ইসলামের ভাবধারা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়ে শুরু হয়েছিল। এর সূত্রপাত ছিল সঠিক এবং উদ্দেশ্যও ছিল মহৎ।

কিন্তু অজ্ঞতা ও সামাজিক মর্যাদার উত্তরাধিকারিত্বের আগ্রহ, যা বিভিন্ন ধর্মীয় পদের নামে আখ্যায়িত করা হয়, এমন লোকদেরকে সামনের কাতারে নিয়ে আসে যাদের না ছিল পর্যাপ্ত

জ্ঞান এবং না ছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের সামর্থ্য। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতের উপর এই বিষয়াদিরই আশংকা করেছিলেন।

কেহ যদি অধিকাংশ সুফী মতবাদের গৃহীত বিষয়াদি, যেমন, আড়ালমুক্ত হওয়া, দায়িত্ব ও কর্তব্যের উর্ধ্বে অবস্থান এবং তাদের মুরীদান ও কুতুবদের বিভিন্ন কার্য-ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে এবং এগুলোকে খৃষ্টানদের ক্ষমার অনুষ্ঠান ও গীর্জায় উপাধি গ্রহণকারীদের মর্যাদা, মিলাদের আনুষ্ঠানাদি এবং ক্ষমার সার্টিফিকেটপ্রথার সাথে তুলনা করে তাহলে সে দেখতে পাবে যে উভয় দলই কোন না কোন দিক দিয়ে একে অপর থেকে এই সব বিষয় বা অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য লাভ করেছে।

সুতরাং অজ্ঞতা বা অন্ধঅনুকরণ জনিত কারণে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ধর্ম বা মুর্খতাযুগের নীতিমালা থেকে অনুপ্রবেশকারী যাবতীয় কালিমা হতে মুক্ত ও পবিত্র ইসলামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রূপ পুনরায় পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনে নিষ্ঠার সাথে ব্রতী হতে হবে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

অর্থঃ "ইয়াহুদী ও খৃষ্টান লোক তোমার উপর কখনও সন্তুষ্ট হবেনা, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করবে। বল, আল্লাহর হেদায়তই প্রকৃত হেদায়ত। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তা হলে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোন অভিভাবক এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবেনা।" (সূরা বাক্বারা- ১২০)

যে সকল মুসলিম উলামাগণ আপন ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রকৃত অভিজ্ঞ, তাঁদের কর্তব্য হলো, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপদেশ-বিবৃতির মাধ্যমে মুসললিম জনসাধারণের সম্মুখে এগুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরা, যেভাবে উহার নির্দেশ রয়েছে ইসলামী শরী'আতের পবিত্র উৎসদ্বয় পবিত্র কুরআন ও বিশ্বস্ত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ সুন্নাতে, যুগে যুগে যার খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন সুপ্রসিদ্ধ উলামাগণ।

প্রত্যেক ধর্ম প্রচারকের এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং প্রত্যেক মুসলমান আলেমকে এই কঠিন সত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

ধর্মপ্রচারক ও সংস্কারগণের ইতিহাসে রচিত হয়েছে উজ্জ্বল উজ্জ্বল অধ্যায়। এর পিছনে কার্যকরী ছিল লোকদের আহবান করার ময়দানে উক্ত পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ গভীর জ্ঞান সরোবর থেকে তাদের যাত্রাভিযানের সূচনা।

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) ছিলেন সেই সেনাদলের অন্যতম, যারা ধর্ম প্রচার ও সংস্কারের ক্ষেত্রে এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করে ছিলেন, যা জ্ঞান বিতরণ ও সমাজসংশোধনে তাবেঈন ও তাদের সঠিক অনুসারীদের মধ্যে প্রথম সারির উলামাদের কর্মপন্থার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রচুর সংখ্যক উলামাদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন তার সমাজে কট্টর সুফীতত্ত্বের প্রভাব ছিল প্রচুর। তার সমাজে বহু লোক কবর পূজায় নিমগ্ন ছিল, যা তাদের উপকার বা কোন অপকার করতে পারতো না। তারা জড় পাথরের বরকত গ্রহণে আসক্ত ছিল এবং তারা যেখানে যা বলার নয় সেখানে তা বলাবলি করতো। এই ভাবে লোকগণ উপকার লাভের অথবা অপকার থেকে মুক্ত হওয়ার আশায় ঐসব জড় পদার্থের ভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তারা সেই আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল যিনি উপকার-অপকারসহ সবকিছুর উপর শক্তিমান। আল্লাহ পাক তো কেবলমাত্র সেই সব আমলই গ্রহণ করেন যা খালেছভাবে তারই জন্য সম্পাদিত হয়ে থাকে।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের নিকট বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর আকারে ধরা পড়ে। কেননা, এর মধ্যে অন্তর ও আমলকে অন্যদিকে ধাবিত করে পরম স্রষ্টা আল্লাহপাকের প্রতি দুঃসাহসিক আচরণ প্রদর্শন করা হয়। অথচ আল্লাহপাকইতো হলেন সব নিয়ামতের প্রকৃত মালিক এবং প্রতিটি বিষয়ের উপর পরম করুণাময় অনুগ্রহশীল।

তখনকার সময় শুধু নজদ এলাকা নয়, প্রতিটি দেশের মুসলিম সমাজে এই দুরবস্থা বিরাজ করছিল। এই সম্পর্কে মার্কিন ঐতিহাসিক লুৎরুব ষ্টুয়ার্ডের নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রনিধাণযোগ্যঃ

'ইসলাম ধর্ম এক কালো আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে একত্ববাদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে পরানো হয় বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ও সুফীতত্ত্বের পোষাক। প্রকৃত নামাজীলোক থেকে মসজিদগুলো হলো প্রায় শুন্য। ইলমের দাবীদার মুর্খ লোকদের সংখ্যা বেড়ে গেল, আর বেড়ে গেল ফকীর-মিসকিনদের দল। তারা আপন আপন গলায় তাবীজের মালা ঝুলায়ে ঝুলায়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে চষে বেড়াতে লাগলো। এরা লোকদের মধ্যে বাতেল ও সংশয়-সন্দেহের বিষ ছড়াতে থাকে, সুফী দরবেশগণের কবর যিয়ারতের প্রতি তাদের উৎসাহিত করতে থাকে এবং কবরের পার্শ্বে বসে কবরবাসীদের শাফা'আত প্রার্থনার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ফলে, লোকদের থেকে কুরআনের ফাজায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান বিলোপ হয়ে যায়। এই সময় যদি ইসলামের নবী পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতেন এবং ইসলামের দাবীদারদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি ক্রোধান্বিত হতেন।'

মক্কার হরম শরীফের ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ খাইয়াতের ভাষায় উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি হলো এমন একজন ন্যায়পরায়ণ শত্রুর পক্ষ থেকে সত্যের সাক্ষ্য

প্রদান, পরবর্তীতে যার ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায়নি। তিনি দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে ইসলাম এবং ইসলামী সমাজের বাস্তব অবস্থা ও উহার অধঃপতন ও অবনতির চিত্র তুলে ধরেন। (১)

উপরোক্ত এই ঐতিহাসিক সম্পর্কে প্রিন্স সাকীব আরসালান বলেনঃ যদি কোন মুসলিম দার্শনিক এই শেষ যুগগুলোতে ইসলামের অবস্থার সঠিক চিত্র তুলে ধরার ইচ্ছা পোষণ করতেন তাহলে তিনি সত্যিকার চিত্র এতটুকু তুলে ধরতে পারতেন না বা বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটাতে পারতেন না, যতটুকু এই মার্কিন ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ড করতে পেরেছেন।

এই সময় নজদ তথা আরব উপদ্বীপ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন অবস্থায় ছিল না। অধিকাংশ দেশে সত্যের উপর বাতেল প্রবল ছিল। কুসংস্কার ও বেদ'আতের প্রভাব ছিল মাত্রারিক্ত। সেখানে আলেমগণ তো ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যথাযথ পন্থায় লোকদের সঠিক পথে চলার পথ-নির্দেশ দিতেন না, বরং তারা লোকদের বিভ্রান্ত করে তাদের ধর্ম বিশ্বাস বিনষ্ট করে ফেলেছিলেন।

নজদবাসী খ্যাতনামা দুইজন ঐতিহাসিকঃ হুসাইন ইবনে গান্নাম আল আহ্সায়ী-পরে নজদী-

---

(১) এই কথাটি হিঃ ১৪০৪ সনের জুমাদাল উলা মাসে উকাজ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অন্তভূক্ত। দেখুন, ইবনে রুওয়াইশীদের গ্রন্থ 'ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব পৃঃ ২৪৫-২৪৬,'মুসলিম বিশ্বের সভ্যতা' থেকে।

(মৃত্যুঃ ১২২৫ হিঃ) ও উছমান ইবনে বিশ্‌র (মৃত্যুঃ ১২৯০ হিঃ) উভয়ই বেশ কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে তৎকালীন আরব ও মুসলিম বিশ্বে আক্বীদাহ ও এবাদতগত দিক দিয়ে মানুষ কি পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে নজদবাসীদের অবস্থা এতে অতি দক্ষতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু তারা উভয়ই পরিস্থিতি ও মানুষের বাস্তব অবস্থা কাছে থেকে স্বচক্ষে অবলোকন করেছিলেন।

হুসাইন ইবনে গান্নাম - যিনি প্রথম থেকেই এই সংস্কারমূলক দাওয়াতী আন্দোলনের সমসাময়িক ছিলেন এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব কর্তৃক লোকদের আক্বিদাহগত পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা ও দাওয়াতের পথে তাঁর উৎসর্গতা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি এই দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এর ইতিহাস লিখেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আল্‌-আহসা থেকে দার'ইয়া শহরে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমরা দেখতে পাই, তিনি তার ঐতিহাসিক গ্রন্থে আরব দেশের এবং বিশেষ করে নাজদ এলাকার সামাজিক অবস্থার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি রিয়াদের সন্নিকটে আল্‌-জুবায়ল শহরে অবস্থিত গম্বুজধারী হযরত জায়েদ ইবনে খাত্তাবের কবর এবং 'রিদ্দা' যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আরো অনেক সাহাবীগণের কবর ও গম্বুজ নিয়ে লোকদের বিধর্মী কার্যলাপের বিশদ আলোচনা করেন। তিনি আরো

উল্লেখ করেন যে, এই সব কবরের নিকট লোকগণ আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হত। তাদের এই বিধর্মী আচরণ শুধু কবরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং বৃক্ষ, পাথর ও জিন-শয়তানদের পর্যন্ত তাদের এহেন দুষ্কর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। (তারিখে ইবনে গান্নাম ১-(৫-১৮)

হুসাইন ইবনে গান্নাম, যিনি উক্ত ঘটনাপঞ্জীর যুগে বসবাস করেছেন এবং তিনি স্বীয় চিন্তাধারার আলোকে তা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং উসমান ইবনে বিশ্র, যিনি চলন্ত ঘটনাবলীর অনেক কিছুই স্বচক্ষে দেখেছেন, এই উভয় ঐতিহাসিকের লিখিত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, নজদ এলাকা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর ন্যায় আকীদাহগত অধঃপতন ও ভ্রান্তির সাগরে নিমজ্জিত ছিল, যা বিভিন্ন তরীক্বাপন্থী পীর-মাশায়েখ ও স্বার্থন্বেষী মহল দ্বারা পরিচালিত হতো।(১)

এখান থেকেই দেখা দেয় শায়খ মুহাম্মদের মধ্যে তাঁর ধর্মীয় অভিমান। সাহসের সাথে শুরু করেন সংস্কারমূলক আন্দোলন। তিনি জ্ঞানের দাবী পূরণার্থে ও ইসলামের নির্দেশ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেন। লক্ষ্য করলেন যে, ঈমানের সাথে আমল অপরিহার্য এবং আমানতের ব্যাপার হলো, যে সব বিষয় জনসাধারণ জানে না, যা তাদের পক্ষে করণীয়

---

(১)'তারিখে ইবনে বিশ্র, ১ম খণ্ড 'উনওয়ানুল মাজদ ফী তারিখে নজদ', পৃষ্ঠা-৩৪,৩৫,৪৪ ও ৪৫।

বা যা তাদের পক্ষে বর্জনীয় সেগুলো তাদের সম্মুখে প্রকাশ করা। কারণ, এমন অনেক বিষয় আছে যা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত অথচ তা সমাজে সম্পূর্ণ পরিত্যাক্ত; আবার এমন অনেক বিষয় মানুষের জীবনে আক্বীদাহ ও ব্যবহারিকগত পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করে আছে যা ধর্মের আওতায় পড়ে না, অথচ মানুষ এর হাকীকত অনুধাবন করে না।

প্রকৃতপক্ষে, উপকৃত আলেমগণ অথবা আত্মম্ভর অজ্ঞ ও বিভিন্ন সুফী মতবাদের লোকগণই ধর্মীয় বিষয় ঘোলাটে করে মানুষের আক্বীদাহসংক্রান্ত বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলে। লোকদেরকে তারা প্রকৃত ইসলামী শরী'য়াত উপলব্ধি করা থেকে বিমুখ রাখে এবং তাদের পছন্দনীয় পার্থিব স্বার্থ এবং ক্ষমতায় আরোহনের মোহে তাদেরকে আকৃষ্ট করে রাখে।

এমতাবস্থায়, এই সংস্কারধর্মী সালাফী দাওয়াতের পক্ষে নিকট-পরিচিতদের অস্বীকৃতি ও অবজ্ঞা, পদলোভীদের ভয়-ভীতি ও বিরুদ্ধাচরণ এবং স্বার্থান্বেষী মহলের শত্রুতার সম্মুখীন হওয়া প্রায় নিশ্চিত ছিল। তাই, শুরু হলো এই আন্দোলনের বিরূদ্ধে অপবাদ ও দোষারোপের বারি বর্ষণ, মিথ্যার বেড়াজাল তৈরী ও বিভিন্ন প্রকার জঘন্য অপনাম ও পদবী আরোপের হিড়িক।

প্রতিটি নতুন বিষয় ও দেশের প্রচলিত প্রথাবিরুদ্ধ চিন্তাধারা এবং কাজকর্মের ক্ষেত্রে এধরনের বিরোধিতা প্রতীক্ষিত থাকে। অতীতে প্রাক ইসলামী

যুগের আরবগণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেছিল (আল-ক্বোরআনের ভাষায়) ঃ

إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

অর্থঃ "আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।"(সূরা যুখরুফ- ২৩)

কিন্তু এই বিরোধিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, স্পষ্ট প্রমাণাদির উপস্থিতি এবং গঠনমূলক আলাপ-আলোচনা ও বিপদাপদের আঘাত সংবরণের পর আর গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শান্ত ও মার্জিত পত্রালাপ, বাস্তববাদী উদ্দেশ্যপূর্ণ বই-পুস্তক রচনা ও মক্কাশরীফের দাওয়াতী বিজ্ঞ উলামাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ভারসাম্য রক্ষাকারী আলেমবর্গের মতামত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইমাম সউদ ইবনে আব্দুল আযীয, যিনি শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নব প্রবর্তিত কোন বিষয়ের অনুসরণ করেননি, তিনি কোন সুন্নাহ বিরোধী কাজ করেননি এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে কুরআনের আয়াত ও ছহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে প্রমাণাদি পেশ করেননি। এর বাস্তব প্রমাণ মিলে ১২২৬ হিঃ সনে মক্কা শরীফের তৎকালীন উলামাগণ ও নজদী উলামগণের এবং একদিকে ইবনে

সাউদসহ নজদ এলাকার উলামাগণ এবং অপরদিকে মরক্কোর উলামগণের মধ্যে সংগঠিত আলাপ-আলোচনা ও সাক্ষাৎকারে, যা মরক্কোর ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।(১)

আমি এই পুস্তকে কয়েকজন নজদী উলামাবৃন্দের কথা উল্লেখ করবো, যারা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতের বিরোধিতা করে তার
দাওয়াতের প্রতি শত্রুতার মনোভাব নিয়ে নজদ থেকে বের হয়ে যান এবং বিভিন্ন অপবাদ ও মিথ্যালাপের মাধ্যমে মুসলমানদের সামনে এর বিকৃত চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেন। তাদের কথাবার্তা, প্রচারণা ও লিখিত বক্তব্যে দূর দেশের অনেক লোক প্রভাবিত হয়ে পড়ে, অথচ ঐ লোকেরা বিরূদ্ধবাদীদের বক্তব্য ছাড়া দাওয়াত সম্পর্কে আর কিছুই জানেনি। এমন কি, তারা শায়খ মুহাম্মদ ও তাঁর সংস্কার আন্দোলনের বিরূদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ, মিথ্যারোপ ও দোষারোপের কারণও জানতে পারেনি।

এই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে মুসলিম বিশ্বের কোন

---

(১) দ্রষ্টব্যঃ—'আল এ'লাম বিমান হাল্লা বি মুররাকিশ ওয়া আগমাত মিনাল আ'লাম'-১০ম খণ্ড, পৃঃ ৭০ ও ৭১।

—'আল ইস্তেক্বছা লি আখবারে দুওয়ালিল মাগরিবিল আক্বছা' ৮ম খণ্ড পৃঃ ১২০-১২২।

—'আল বায়ানুল মুফীদ ফীমা ত্তাফাক্বা আলাইহি উলামাউ মাক্কাতা ওয়া নাজদ মিন আক্বাঈদিত তাওহীদ', প্রথম সংস্করণ সন ১২৪৪ হিঃ।

কোন আলেমদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হয়, যাদের কাছে এই এলাকার কতক লোক আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের সম্মুখে আন্দোলনের চিত্র এমনভাবে তুলে ধরেছে যা সম্ভবতঃ কেবল তাদের মানসিক প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল এবং যা অনেক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপর মহলগুলোকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। মূলতঃ এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল তথাকথিত আলেম-উলামাদের মধ্যকার পারস্পারিক হিংসা, দ্বন্দ, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও বিরোধ।

গ্রন্থটি রচনার হেতু

যে গ্রন্থটি আমাকে এই বিষয়ে কলম ধরতে উৎসাহিত ও বাধ্য করেছে সেটি হল: ইমাম মালেক(রহঃ)-এর মাজহাবের উপর লিখিত একটি পুরাতন ফেক্হী গ্রন্থ। মরক্কোবাসী ভাইদের অন্তরে এর প্রতি প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। গ্রন্থটি 'দারুল গরব ইসলামী সংস্থার' মাধ্যমে সম্প্রতি বৈরুতে ছাপা হয়েছে। গ্রন্থটির নাম: 'আল মি'য়ারুল মু'রিব ওয়াল জামিউল মুগরিব আন ফাতাওয়া উলামায়ে আফ্রিকা ওয়াল উন্দুলুস ওয়াল মাগরিব', রচনায়: আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল ওয়ানসুরায়সী, প্রকাশনায়: দারুল গরব আল ইসলামী, বৈরুত ১৪০১ হিঃ মোতাবেক ১৯৮১ ইং। উক্ত গ্রন্থের একাদশ খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় প্রশ্নাকারে এক শিরোনামার অধীনে লিখিত বিষয়বস্তুই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রশ্নটি ছিল এরূপ-‘ওহ্হাবী মতাবলম্বীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে?’। প্রশ্নটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও সতর্কতার উদ্দীপক। বিশেষ করে, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব(রহঃ)-এর এই আক্বীদাহগত সংস্কারধর্মী আন্দোলন ও তাঁর সমর্থক ও তাদের অনুসারীগণ শত্রুদের কর্তৃক আরোপিত এই (ওহ্হাবী) নামেই প্রায় পরিচিত হয়ে উঠেন। যদিও অনেকে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবকে চিনে না বা তাঁর আন্দোলন কোথায় শুরু হয়েছে তাও জানে না।

শত্রুদের কর্তৃক ব্যবহৃত এই পরিভাষা মূলতঃ বিদ্বেষ ও ঘৃণাভরে আরোপ করা হয়েছে। এই পরিভাষা বা উপনাম কোন কোন সুফী সম্প্রদায় ও তাদের স্বার্থসংরক্ষণকারী মহলকে সক্রিয় করে তুলে। এটা এই উদ্দেশ্যেও হতে পারে যে, এর দ্বারা মুসলমানগণক বিভিন্ন দল-উপদলে বিচ্ছিন্ন করা যাবে এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত মতে প্রবর্তিত ও প্রচলিত প্রকৃত দ্বীন থেকে তাদের দূরে সরানো যাবে। কেননা, সাউদ পরিবারের সাহায্য ও সহযোগিতায় নজদ অঞ্চলে এই আন্দোলনের অভ্যুদয় এবং প্রত্যেক স্থানে এর প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ প্রকাশের এই সময়টিই ছিল মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের সক্রিয় তৎপরতা ও আগ্রাসন এবং তাদের সম্রাজ্যবাদী নীতি “বিভক্ত কর এবং শাসন কর” বাস্তবায়নের যুগ।

এই অসৎ উদ্দেশ্য দ্বীনে ইসলামীর শত্রুদলের কুপ্রবৃত্তির সাথে এক হয়ে যায়। এই শত্রুরা মুসলমানগণের মধ্যে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিনষ্ট ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে অত্যন্ত আগ্রহী ও সদা সচেষ্ট, যে ভ্রাতৃত্বের প্রতি আমাদের দ্বীনে ইসলাম আহবান জানায় এবং ইসলামী শিক্ষা-নীতিও তৎপ্রতি অতিব গুরুত্ব প্রদান করে ।

আল্লাহপাক বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

অর্থ: "মুমিনগণ পরষ্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা আপন ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা তার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। হে মুমিনগণ, কোন লোক যেন অপর কোন লোককে উপহাস না করে।" (সূরা হুজুরাত- ১০ ও ১১)

এক হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر »

অর্থ: মুমিনগণ তাদের পাস্পরিক সৌহার্দ ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে একটি শরীরের মত, যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে শরীরের অপর সব অঙ্গ জ্বর ও অনিদ্রায় ভূগতে থাকে।" (তিরমিজী)

শত্রুদের এই চক্রান্তের লক্ষ্য ছিল: মুসলমানদের সারিতে সংঘাত ও বিদ্বেষের প্রেতাত্মা জাগিয়ে তুলা।

কারণ, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, একদিকে যেমন ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তবে এই পদবীবাক্যের দারুণ প্রভাব পড়বে, অন্যদিকে যেহেতু মুসলিম বিশ্বে নিরক্ষরদের সংখ্যা অনেক উর্দ্ধে, লোক পড়াশুনা করেনা যে প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারবে। তারাতো কেবল তাই বুঝে যা দাবীদার আলেমগণের মাধ্যমে শাষকবর্গের নির্দেশে তাদের সম্মুখে পেশ করা হয়। তারা মনে করে এই সব আলেমদের পক্ষ হতে যা বলা হবে তা সবাইকে মানতে হবে। যদিও এই সবের মধ্যে অনেকের পক্ষ হতে সত্যের আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছিল এবং লোকদেরকে এর প্রতি আহবান করছিল, কিন্তু তাতে কি হবে, তাদেরতো অবস্থা হল প্রবাদ বাক্যের মত 'চোখে দেখে কিন্তু হাতে নাগাল পায় না।'

হরম শরীফের ঈমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল গণী খাইয়াত (রহঃ) 'দৈনিক উকাজ' পত্রিকার বুধবার সংখ্যায় 'লামহা' কলামে উল্লেখ করেন যে, উস্তাদ আহ্মাদ আলী কাজেমী তার রচিত একটি গ্রন্থে 'হারফোরড ব্রাইজিস' নামক একজন বৃটিশ অফিসার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এই বৃটিশ অফিসার পলিটিক্যাল সেক্রেটারী হিসাবে ১১৯৯ হিঃ থেকে ১২০৯ হিঃ পর্যন্ত ইরাকে অবস্থান করেন এবং তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সমসাময়িক ছিলেন। আমীর সাউদ ইবনে আব্দুল আযীযের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই আমীরই ১২১৮ হিজরীতে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর প্রথম সউদী রাজত্বের তৃতীয় শাসক হিসেবে দায়িত্ব

গ্রহণ করেছিলেন। ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কে এই বৃটিশ অফিসারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে। তার মূল বক্তব্যটি হলো নিম্নরূপঃ

"উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রচার করে যে, মুহাম্মদ ইবনে সাউদ লোকদের মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু আসলে তিনি রওজা শরীফের সম্মুখে শির্কী কার্যক্রম চালাতে নিষেধ করতেন, যেভাবে তিনি আওলিয়াদের কবরে ইবাদত করতে নিষেধ করতেন। সহজ সরল সাধারণ লোকগণ প্রভাব-প্রতাপের অধিকারী শাসক ও অন্যান্যদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে ওহ্হাবী আন্দোলন অর্থাৎ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সালাফী দাওয়াতকে একটি কুফরী মতবাদ হিসেবে ধারণা পোষণ করতো এবং মনে করতো যে, এই পথে যে চলবে সে নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, এই মতবাদ অধ্যয়নকারী প্রত্যেক পাঠকের কাছে সঠিকভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে যে, শায়খ মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মৌলিক নীতিমালায় কিতাব ও সুন্নাতের পথেই চলেছেন।

ফেক্বাহ্ অর্থাৎ ব্যবহারিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বা মাজহাবী দৃষ্টিকোণ থেকে শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তিনি কোন পঞ্চম মাজহাব প্রবর্তন করেননি। যেমন, শত্রুপক্ষ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে জনসাধারণের সম্মুখে এমন কথা প্রচারিত করেছে। হাম্বলী

মাজহাবের ফেক্বাহ্ নজদ এলাকায় প্রচলিত হয় শায়খ মুহাম্মদের জন্মের প্রায় এক যুগ পূর্বে। দামেস্কের ছালিহিয়া মাদ্রাসা ও মিশরে অধ্যয়নকারী ছাত্ররা নজদ এলাকায় এই মাজহাব নিয়ে আসে। এর পূর্বে অত্র এলাকায় ব্যাপক ভাবে মালেকী ও হানাফী মাজহাবের প্রচলন ছিল।

বারখারদিত সত্যিই বলেছেন:'ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কে যা রটানো হয়েছে, তার কারণ ছিল, এই দাওয়াতী আন্দোলনের হাক্বীকত অনুধাবনে লোকগণ ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল ইসলামের আভ্যন্তরীণ একটা সংস্কারমূলক আন্দোলন।'

এটি এমন এক সাক্ষ্য যার স্বীকৃতি দিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলামকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম হিসাবে স্বীকার করেন না। অথচ তিনি একজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির মত বাস্তব ঘটনার বর্ণনা দিলেন, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ছাড়া আরো অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা এরূপই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারা হলেন:

১। প্রফেসর মানহ হারুন- যার বক্তব্য ছিলো ইংলিশ লিখক 'কন্ত ওয়েলস' এর প্রত্যুত্তরে।
২। মার্কিন গবেষক 'লুথরুব স্টুয়ার্ড'- তার "বর্তমান মুসলিম বিশ্ব" নামক গ্রন্থে।
৩। জার্মান প্রাচ্যবিদ কার্ল ব্রকোলমান- তাঁর 'মুসলিম জাতি সমূহের ইতিহাস' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের ৪র্থ

খণ্ডে এই আন্দোলনের পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন।

৪। জার্মান ঐতিহাসিক ডাকো পোর্ট ফোন মিকোয়াইল- তার গ্রন্থ 'আব্দুল আযীয', প্রকাশিত জার্মানী ১৯৫৩ ইং।

৫। প্রফেসর দেলফরদ কান্তোল- তার 'পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ইসলাম' গ্রন্থটি একদল প্রাচ্যবিদ সংকলন করেন।

৬। ফরাসী জ্ঞানতাপস বার্ণার্ড লুয়াইস-তার গ্রন্থ 'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আরব জাতি'।

৭। অষ্ট্রিয় প্রাচ্যবিদ 'গল্ড জিহার'-তার গ্রন্থ 'আক্বীদাহ ও শরীয়াহ'।

৮। বৃটিশ প্রাচ্যবিদ গিব- তার গ্রন্থ 'মুহাম্মদী মতবাদ'।

৯। ফরাসী প্রাচ্যবিদ সিদিও- তার গ্রন্থ 'আরব জাতির সাধারণ ইতিহাস'।

বৃটিশ ইন্‌সাইক্লোপেডিয়ায় বলা হয়েছেঃ

"ওহ্হাবী আন্দোলন ইসলামের একটি সংস্কারধর্মী আন্দোলন। ওহ্হাবীগণ কেবল মাত্র রাসূল (ছাল্লা ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষা অনুসরণ করেন, অন্যের কথা বাদ দেন। প্রকৃতপক্ষে, ওহ্হাবী আন্দোলনের শত্রুগণ সঠিক ইসলামেরই শত্রু।"(১)

---

(১) দেখুন,'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব', প্রণয়নেঃ আব্দুল্লাহ ইবনে রুয়াইশিদ,২/৩৪৫-৩৫৪, এর মধ্যে ঐ লোকদের অনেক উদ্ধৃতি ও রয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের কোন কোন দেশেও সত্যের পক্ষে ন্যায়বান কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হতে দেখা যায়; কেননা, সত্যিকারভাবে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াত লোকের কাছে পৌঁছানো তখনকার দিনে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

১। শায়খ মোহাম্মদ বশীর সাহসওয়ানী হিন্দী, গ্রন্থ-'সিয়াসাতুল ইন্‌সান আন ওয়াসওয়াসাতিল দাহলান'।

২। শায়খ মাহমুদ শুকরী আলুসী ইরাকী, গ্রন্থ-'তারিখে নাজদ'।

৩। শায়খ আহমদ ইবনে সাঈদ বাগদাদী, গ্রন্থ-'নাদীমুল আদীব'।

এই সাথে রয়েছেন- সিরিয়বাসী শায়খ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বাইতার, শায়খ তাহের আল জাযায়েরী ও শায়খ মোহাম্মদ কামেল আল-ক্বাচ্ছাব। এরা সবাই এই দাওয়াত বা আন্দোলন সম্পর্কে পর্যালোচনা করে সন্তুষ্ট হন এবং অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই দাওয়াত সঠিক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা সিরিয়ার জনগণের মধ্যে এই দাওয়াত ব্যাপক ভাবে প্রচার শুরু করেন। যার ফলে, উছমানী শাসকবৃন্দ দাওয়াতের নেতা শায়খ জামালুদ্দীন ক্বাসেমীকে ইংরাজী ১৯০৮ সনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। তবে কোর্ট তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে মুক্তি প্রদান করে।

এতদ্ব্যতীত দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞ আলেম এই আন্দোলন বা দাওয়াতের পক্ষে আপন আপন গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন :-

সাইয়্যিদ মোহাম্মদ রশীদ রেজা,-'সংস্কারক ও মুক্বাল্লিদের মধ্যে বাক্যালাপ', 'ওহ্হাবীগণ ও হেজাজ' ও আল-মানার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ;

মোহাম্মদ কুরদ আলী, সাকীব আরসালান, ফিলিপ হিত্তি, আমীন সাঈদ, আলী তান্তাওয়ী, যারকালী, মোহাম্মদ জমীল বাইহাম, উমর আবু নছর,আব্দুলমুতা'আল ছা'য়ীদী-'সংস্কারকগণ',

হামিদ ফাক্বী, 'ওহ্হাবী আন্দোলনের প্রভাব', আব্দুল আযীয বকর, তাঁর গ্রন্থঃ 'আরবী সাহিত্য ও উহার ইতিহাস', মোস্তফা হাফনাওয়ী, ডঃ আহমদ আমীন, তাঁর গ্রন্থঃ 'সংস্কারবাদী নেতৃবৃন্দ',

মোহাম্মদ ক্বাসিম, তাঁর গ্রন্থঃ 'ইউরোপের ইতিহাস',মান্নাউল ক্বাত্তান, তাঁর গ্রন্থঃ'ইসলামের দাওয়াত', আব্দুল করীম আল-খতীব, তাঁর গ্রন্থঃ'মোহাম্মদ ইবনে আব্দুলওহ্হাব', মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন-আল ইরশাদ ম্যাগাজিন, কুয়েতঃ রজব ১৩৭৩ হিঃ, ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মাজী- 'মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা', আহমদ হুসাইন- 'আমার দেখা আরব উপদ্বীপ'(১৯৪৮ ইং), আল আক্বাদ- 'বিংশ শতাব্দীতে ইসলাম', তাহা হুসাইন-১৩৫৪ হিজরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-'আরব উপদ্বীপে সাহিত্যের ধারা', কাতারের ক্বাজী শায়খ আহমদ

ইবনে হজর-'শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব', মাসউদ নদভী- 'নির্যাতন ও অপবাদের শিকারে একজন সংস্কারক', ডঃ মোহাম্মদ জামীল গাজী- 'দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কারক', আমীন সাঈদ- ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের জীবন-চরিত', মুসলিম আলজুহানী- 'মুসলিম বিশ্বে শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের প্রভাব', শায়খ ডঃ ছালেহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-'আববুদ-'মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সালাফী আক্বীদাহ'। এঁদের ছাড়া আরো অনেক বিজ্ঞ জ্ঞানীজন এই দাওয়াতের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ওহ্হাবী মতবাদ নামে এই সালাফী দাওয়াতের নামকরণ সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তা ছিল বিশুদ্ধীকরণের এই সালাফী দাওয়াতের বিরুদ্ধপক্ষ কর্তৃক আরোপিত একটি উদ্দেশ্যমূলক বিষয়। আল্লাহর দ্বীন রক্ষার দাওয়াতের উপর ভিত্তি করে আরব উপদ্বীপ থেকে উৎসারিত এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল ঃ ইসলামী শিক্ষার সাথে সংমিশ্রিত কুশিক্ষা এবং খালেছ তাওহীদের ক্ষেত্রে স্রষ্টার সাথে তার খাছ বিষয়ে সৃষ্টির অংশীদারিত্ব দূরীভূত করা, যা ছিল হাদীছে কুদ্সীতে বর্ণিত আল্লাহ পাকের বক্তব্যের পরিপন্থী। উক্ত হাদীছে কুদ্সিতে আল্লাহপাক বলেনঃ

« أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته و شركه »

অর্থঃ "আমি অংশীদারিত্বের প্রতি সব শরীকদের চেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি তার কোন কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে, আমি তাকে তার শিরকসহ বর্জন করি।

(মুসলিম শরীফ, অধ্যায়- রিয়া)

বিষয়বস্তু ও উহার সংশ্লিষ্ট কারণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ ও দীর্ঘ দিন থেকে মানুষের মন-মস্তিষ্কে জমে থাকা ভুল-ভ্রন্তির সংশোধনকল্পে বলিঃ

বিরুদ্ধপক্ষের এইসব লোকেরা ঐ দাওয়াতকে ওহ্হাবী আন্দোলন নামে নূতন পরিভাষায় আখ্যায়িত করেছে শুধু ঘৃণা ছড়ানো ও সত্যের বিকৃতি সাধনের উদ্দেশ্যে। পরবর্তী লোকেরা আন্দোলনকে এই নামেই গ্রহণ করে। দেখা যায়, এই পরিভাষা প্রথম যারা প্রচার করে তারা হলো-কোন কোন সুফী-দরবেশগণের অনুসারীরা, যারা নিষ্কণ্টক দ্বীনে ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি, যাতে তারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী ইবাদত করতে পারে, কেননা, ইসলামেতো কোন বৈরাগ্যের স্থান নেই।

তাদের এই বিরোধিতার প্রকৃত কারণ হলো, যারা এই সুফী মতবাদগুলোর অনুসরণ করছে, তারা আপন ব্যক্তিগত দিকটাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তাই, পার্থিব উপার্জন হারানোর ভয়ে তারা কেবল স্বার্থের সংরক্ষণ ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে এবং একথা ভুলে যায় যে, ইসলামের

শিক্ষা ও শরী'য়াতী বিধি-বিধান তাদের এই স্বার্থের অনেক উর্ধ্বে। এটাও তারা ভুলে গেছে যে, খালেছ আমল সম্পাদনে একমাত্র আল্লাহপাকই উদ্দেশ্য হওয়া অপরিহার্য।

সুফী দরবেশগণের দৃষ্টিতে কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জনের পথে তাদের অস্ত্র হলোঃ সাধারণ লোককে ভ্রান্ত করা, শাসকবৃন্দের সম্মুখে এই দাওয়াত সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করা এবং শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি এই নব কণ্ঠকে হুমকী স্বরূপ উপস্থাপিত করার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার ভয়ভীতি জাগিয়ে তুলা।

ইসলামের শত্রুগণ এই চক্রান্ত ও বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণ করে। যেহেতু এটা তাদের মনোবৃত্তির সহায়ক ছিল। কেননা, তারা মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন অথবা তাদের মধ্যে অমঙ্গলের বীজ বপন করার প্রতি অতীব আগ্রহী ছিল। কেননা, শত্রুগণ ভাল করেই জানতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে, দ্বীনে ইসলামের প্রতি এই সঠিক দাওয়াতের প্রচার ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত হলে মুসলিম বিশ্বে তাদের স্বার্থ ও আধিপত্য হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এই বিষয়ের উপর অনেক লোক বই-পুস্তক লিখেছেন। আল্লাহ পাকের কাছে দু'আ করি, তিনি যেন এই পুস্তকগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের উপকৃত করেন এবং তাদের মধ্যে বিভ্রান্ত লোকদের সরল

সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবকিছুই করতে পারেন।

তবে যে বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আমাকে এই দিকটা সম্পর্কে কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা হলো মালেকী মাজহাবের উপর লিখিত উপরোক্ত সেই ফেক্বাহর প্রাচীন গ্রন্থটি।উক্ত গ্রন্থে 'ওহ্হাবী মতাবলম্বীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে?' নামের শিরোনামটি আমার টনক নেড়ে দেয়।

এই প্রশ্নের উদ্বৃতি পড়ে যা পেয়েছি তা হলো নিম্নরূপ ঃ

ওহ্হাবিয়া মতাবলম্বীদের একদল সম্পর্কে শায়খ লাখামীকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ যারা মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে এবং ইতিমধ্যে তারা আপন মতবাদ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে একটি মসজিদও নির্মাণ করে ফেলেছে............ -(শেষ পর্যন্ত) সুতরাং আল্লাহপাক পৃথিবীতে যাদের শাসন ক্ষমতা দিয়েছে তারা কি ওদের নিন্দা জ্ঞাপন করে মারপিট করতে এবং এই মতবাদ থেকে তওবা না করা পর্যন্ত তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ রাখতে পারবে ?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করা হলেও এই ফির্কা সম্পর্কে বিশদ কোন বিবরণ দেওয়া হয়নি। এটাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে,

ওহ্হাবিয়া বলে কি সেই আব্দুল্লাহ ইবনে ওহব রাসিবী খারিজীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে যে হজরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে ৩৮হিঃ সনে নিহত হয়; কেননা, সে 'ফয়ছালার'(১) ঘটনার পর হজরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, না অন্য কারো দিকে, স্থান, কাল যাই হোক, সম্বন্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া উক্ত জবাবে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। বরঞ্চ মরক্কোবাসী এক আরব ভাই অন্যান্যদের মত বুঝে নিলেন যে, এখানে শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, প্রথম থেকে মানুষের স্মরণে যা থাকে গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার মন-মস্তিষ্কে তাই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। এতদসত্বেও উক্ত ধারণা পোষণকারী ভাই যেহেতু শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন তাই তাঁর সাথে বাস্তবমুখী আলাপ-আলোচনা হলে পর তিনি তাঁর আগের ধারণা পরিত্যাগ করেন। আল্ হামদুলিল্লাহ, আমার এই বইটি তারই জবাবে লিখা হলো।

উক্ত ভদ্রলোক ও তার মত অন্যান্যদের ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখা যেতে পারে। কারণ, এই দাওয়াতের প্রতিই সর্বদিক থেকে হামলা পরিচালিত

---

(১) (হজরত আলী (রাঃ) ও হজরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত মিমাংসা বা ফয়ছালা।) দৃষ্টব্য- 'আল কামেল লি ইবনিল আছীর': ৩৮হিজরীর ঘটনাপঞ্জী।

হচ্ছিল, অথচ এর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে লোকের সংখ্যা ছিল অল্প। এছাড়া এই নাম লোকমুখে বহুল প্রচারিত হয়ে পড়ে এবং ওহ্হাবিয়া রুস্তুমিয়া খারিজিয়া আবাজিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে মরক্কোর ওলামাগণের পূববর্তী ফত্ওয়া লোকদের মধ্যে এই নামের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর সহায়ক ছিল এবং আহ্লে সুন্নাত ও জামায়াতের বিরোধিতার কারণে এই মতবাদের অনুসারীদের কাফের বলে আখ্যায়িত করে। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে শুধু লাখামী নয় শায়খ সায়ূরীর মত আরো অনেক আলেম ফাত্ওয়া দিয়েছেন।

এই প্রেক্ষাপটে আমি চাই, প্রথমে একথাটিই সাব্যস্ত করা যে, প্রশ্নকারী ও জবাবদাতা কর্তৃক কোন্ দল বা লোকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এরপর আসে জ্ঞানের আমানত ও জানা বিষয়বস্তু প্রতিপাদনের দাবী অনুযায়ী উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে সন্দেহের বেড়াজাল ছিন্ন ও অপসারণ করা, যা অধিকাংশ লোকই জানেনা। এছাড়া এই ভ্রান্তির চতুর্পাশ্বে আরো অনেক চিন্তধারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আরো ব্যাপক রূপ ধারণ করতঃ কোন কোন বিশুদ্ধ সালাফী আন্দোলনের উপরও এমন লেবাস পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা উক্ত দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ওহবী বা ওহ্হাবী ...... এরা কারা?

এই আব্দুল ওহ্হাব ইবনে রুস্তুমের দিকে সম্বন্ধ করে তারই হাতে ও নামে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দিতে উত্তর আফ্রিকায় ওহ্হাবিয়া ফের্ক্বার ব্যাপক প্রচার সাধিত হয়। এই ফেরকার উৎস ছিল ওহবিয়া আবাজিয়া খারিজী মতবাদ, যা উহার মূল প্রবক্তা ওহবী ফির্ক্বার প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওহ্ব আল রাসিবীর প্রতি সম্বন্ধিত ছিল। কেউ কেউ এই মতবাদকে রাসিবিয়া নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

যেহেতু মরক্কোর সুন্নী জামাতের সবাই উক্ত মতবাদের বিরোধী ছিলেন, যেহেতু এটা ছিল তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী; তাই, তাদের অনেক আলেমগণ উক্ত ফের্ক্বাপন্থীদের কাফের বলে ঘোষণা করেছেন, যা আমরা তাদের অনেক পুরাতন ফাতওয়াসমূহে দেখতে পাই।

তাই আমি চাই, বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণ করতে। এই উদ্দেশ্যে আমি আলী ইবনে মুহাম্মদ লাখামীর জীবন-চরিত পর্যালোচনা করি, যার প্রতি উক্ত প্রশ্ন পেশ করা হয়েছিল। দেখা যায়, এই লোক ৪৭৮ হিজরী সনে সাফাক্বিস নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি ছিলেন কায়রোয়ানবাসী মালেকী মাজহাবের একজন সুপ্রসিদ্ধ ফক্বীহ।

লিখক আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া ওয়ানসুরাইসী সম্পর্কে 'আল মি'য়ার' গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডের কভারে তাঁর নামের নিম্নাংশে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি ফাস নগরে ৯১৪ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। (১)

অপরদিকে নজদ এলাকায় সংস্কারধর্মী সালাফী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের তখনও জন্ম হয়নি। কেননা, রিয়াদের অদূরে 'আল উয়াইনা' নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয় হিঃ ১১১৫ সনে এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদের সহযোগিতায় দার'ইয়া নামক অঞ্চলে তার আন্দোলন শুরু হয় হিঃ ১১৫৮ সন থেকে।

ফাত্ওয়ার জবাবদাতা শায়খ লাখামীর মৃত্যুর হিসেব মতে পূর্ববর্তী প্রশ্নের উক্ত জবাব ছিল শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে এবং গ্রন্থকার আল-ওয়ানসুরাইসীর মৃত্যুর দুইশত বৎসরেরও অধিক পূর্বে। এদুটু বিষয়ই যথাযথ বিচার বিশ্লেষণকারী ও সাদৃশ্য নির্ধারণ-কারীদের সম্মুখে জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে।

এই সমস্যাটিই আমাকে উক্ত মতবাদের উৎস ও সূচনার সময় সম্পর্কে মরক্কোর বই-পুস্তকে ঐতিহাসিক পর্যালোচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কেননা, বিষয়টি ভুলভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় আবৃত। এর উদ্দেশ্য জানার জন্য হোক, আর জবাবদানকারী ও -

----

(১) দ্রষ্টব্যঃ 'আল হুলালুস সুন্দুসিয়াহ, পৃঃ ১৪৩ ও 'আল আ'লাম লিয যারকালী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮।

গ্রন্থকারের অজান্তে সংযোজিত বিষয়গুলো জানার জন্য হোক, এটা স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে, এই সওয়াল ও তার জবাব উভয়টি আল-ওয়াইনসুরাইসির বক্তব্যে কখনও ওহবিয়া নামে, আবার কখনও ওহ্হাবিয়া নামে উল্লেখিত হয়েছে। এর উপর প্রকাশক বা প্রতিপাদনকারীর কোন টিকা নেই। এতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, অনেক মাগরিবী বই-পুস্তক, বিশেষ করে আক্বীদাহ সংক্রান্ত বই-পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে এজাতীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকতে পারে।

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীকে উহার উৎসগুলোর সাথে সমন্বিত করা এবং পাঠকবর্গকে কোন কোন উৎসের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় ও অধ্যয়নে অংশীদার করার তাগিদে বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐতিহাসিক পর্যালোচনার একান্ত প্রয়োজন। যাতে আমরা জানতে পারি, ইসলামী সমাজে সংস্কারধর্মী প্রতিটি কাজের প্রতি ঘৃণা ও বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিম উম্মতের ইতিহাসে ইসলামের শত্রুরা কিভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করছে। কেননা, তারা ইসলামের হাক্বীকত ও উহার সঠিক পন্থায় চললে মুসলমানদের উপর উহার প্রভাব সম্পর্কে খুবই সচেতন। এটাও তারা জানে যে, ইসলামী সঠিক বিধি-বিধান মেনে চললে মুসলমানদের মধ্যে যে প্রীতি, ভালবাসা ও ঘনিষ্ট সম্পর্কের সৃষ্টি হবে, তাতে কোন শত্রু-শক্তি মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করতে বা মুসলমানদের অভ্যন্তরে কোন স্থান লাভ করতে পারবে না। রাসূল

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন:

« أُعطيتُ خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » -وذكر منهن- « ونصرتُ بالرعب مسيرة شهر »

অর্থ: "আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নবীকে দান করা হয়নি। তন্মধ্যে একটি হলো: আমাকে একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত ভীতি-শ্রদ্ধার দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।"
(বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং শত্রুদের তো মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশের পথ করে নিতে হবে, যাতে করে 'বিচ্ছিন্ন কর এবং শাসন কর' তাদের এই প্রসিদ্ধ উপদেশবাক্য অনুযায়ী তারা মুসলমানদের নিকট মওজুদ সম্পদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শত্রুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের নিয়ন্ত্রণাধিকার, মুসলিম জগতের সম্পদ ভোগ এবং মুসলমানদের উপর স্নায়ুবিক ও মানষিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা ততক্ষণ সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না তারা মুসলমানদের মধ্যে বিবেদ-বিচ্ছেদ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও জামাতে জামাতে পারস্পরিক ঘৃণা-বিচ্ছেদ ও হিংসা-বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে পারে।

ইসলামের শত্রুগণ ঠিক শয়তানের মতই। সর্বদা গোপনে গোপনে কথাবার্তা শুনার চেষ্টা করে। যখনই ব্যবহার করার মত কোন কথা শুনতে পেলো তখনই পরস্পরের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে

বিশৃংখলা সাধনের উদ্দেশ্যে এর সাথে নানা কথা জুড়ে প্রচার করতে শুরু করে।

বহু ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি এবং আমার নজরে পড়া সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জীর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই অভিমত গ্রহণ করছি। আমার সম্মুখে গবেষণা-পর্যালোচনা কালে সংগৃহীত উত্তর আফ্রিকায় প্রচারিত ওহ্হাবী ফের্কা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যাদি হাজির রয়েছেঃ

(১) ডঃ সাইয়্যিদ আব্দুল আযীয সালিম রচিত 'আল মাগরিবুল-কাবীর' নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডে আব্বাসী যুগ অধ্যায়ে ৫৫১-৫৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, মরক্কোর থার্ত শহরে রুস্তমী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান ইবনে রুস্তম ১৭১ হিজরীতে যখন তার মৃত্যু আসন্ন অনুভব করলেন, তখন রুস্তমিয়া রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় সাতজন ব্যক্তিকে ডেকে তাদের হাতে রাজ্যভার অর্পণের ওছিয়ত করলেন। এদের মধ্যে ছিলেন তার ছেলে আব্দুল ওহ্হাব ও ইয়াজিদ ইবনে ফান্দিক। ইতিমধ্যে আব্দুল ওহ্হাবের হাতে বায়'আত গৃহীত হয়ে গেলে তার ও ইবনে ফান্দিকের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়।

এবাজিয়া মতবাদ যা ইবনে রুস্তম ও তার সাথীদের ধর্ম, সেই একে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে প্রচার করে; পরবর্তীকালে এই মতবাদ দুটি ফের্ক্বায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটির নাম হলো আল

ওহ্হাবিয়া, যার সম্বন্ধ হলো আব্দুল ওহ্হাব ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রুস্তম এর প্রতি, আর অপরটি হলো 'আল নাকারিয়া'। উভয় ফের্কার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আত্মকলহ হয় অনেক। পরে নাকারিয়া দল পরাজয় বরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নেতা ইবনে ক্বান্দিরা নিহত হয়। নাকারিয়াদের দুর্বলতার সুযোগে মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের আল-ওয়াহিলিয়া ফের্ক্বাটি এসে তাদের সাথে যোগদান করে।

শেষ জীবনে আব্দুল ওহ্হাব হজ্জ পালনের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু আব্বাসী শাসকদের ভয়ে তার অনুসারীরা তাকে হজ্জে না গিয়ে নাফুসায় অবস্থান করার পরামর্শ দেয়।

উত্তর আফ্রিকায় ব্যাপক আকারে সম্প্রসারিত রুস্তমিয়া সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল ওহ্হাব ২১১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে।

(২) ফরাসী লেখক শারলী আন্দ্রেয় তার "উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস"(আরবী অনুবাদঃমুহম্মদ গাজালী ও বশীর ইবনে সালামা) নামক গ্রন্থে খাওয়ারিজদের শাসিত যে সব সাম্রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন তন্মধ্যে রুস্তমী থার্ত রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। লেখক এই ফের্ক্বার ধর্ম বিশ্বাস, রাজ্যের বিস্তৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন সমূহের বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রুস্তমের নামানুসারে এই ফেরকার নাম ওহ্হাবিয়া রাখা হয়। যে ইবনে রুস্তম

বিশ্বাসগত দিক দিয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করেছে; যেমন, লেখক স্পষ্ট করে লিখেছেন, যে, তার এই মতবাদ আক্বীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ও জামাতের পরিপন্থী প্রমাণিত হয়। (১)

(৩) এভাবে লিখক 'আলফ্রেড বেল' তার "উত্তর আফ্রিকায় ইসলামী ফের্‌ক্বাসমূহ" নামক গ্রন্থে আরব বিজয় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই দেশগুলোর ইতিহাস আলোচনা করেছেন। ফরাসী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের কয়েকটি অংশ আব্দুর রহমান বাদাওয়ী আরবীতে অনুবাদ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ওহ্হাবী খাওয়ারিজগণ, যারা আব্দুলাহ্ ইবনে ওহব আল-রাসিবির প্রতি সম্বন্ধ করে নিজেদের নামকরণ করেছে এবং যে রাসিবির বিরুদ্ধে হজরত আলী(রাঃ) নাহ্‌রাওয়ান যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, এরাই ছিল আবাজিয়া খাওয়ারিজ সম্প্রদায়ের লোক।

উক্ত লেখক এই দলের বিভক্তি সম্পর্কে আরো বলেন যে, থার্তের মাগরিবী আবাজিগণ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাদেরই ছিল রুস্তুমী সাম্রাজ্য। এরা ছিল কঠোর পক্ষপাতদুষ্ট একটি ভ্রান্ত ফের্‌ক্বা।

এরপর গ্রন্থকার আব্দুল ওহ্হাব ইবনে রস্তুমের অনুসারীদের সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। এই সেই আব্দুল ওহ্হাব, যার নামানুসারে তার দলকে ওহ্হাবীয়া নামকরণ করা হয় এবং যে তার

----

(১) উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৪০ থেকে ৫০ পৃঃ ও অন্যান্য স্থনে।

মাজহাবে আমল ও আক্বীদাহ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধন করে। তিনি বলেন, এরা তাক্বওয়ার দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং এরা শিয়া সম্প্রদায়কে সেই মাত্রায় ঘৃণা করতো যেমাত্রায় তারা সুন্নী জামাতকে ঘৃণা করতো। (১)

(৪) 'যারকালী' তাঁর 'আল-আ'লাম' নামক গ্রন্থে এমন দশটি পুস্তক থেকে এ বিষয়ে খোলাছা টেনে লিখেছেন, যেগুলোতে আবাজীয়া এবং আলজিরীয়ার অর্ন্তগত থার্তের রুস্তুমিয়া সাম্রাজ্যের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। যারকালীর লিখা মতে জানা যায় যে, এই আব্দুল ওহ্হাব আবাজীয়া ফের্ক্বার রুস্তুমীয়া গ্রুপের দ্বিতীয় ইমাম। সে ইরানী বংশোদ্ভূত এবং তার পিতার জীবদ্দশায় তাকেই ইমাম হিসেবে মনোনিত করা হয়। তার পিতা ইমামতির বিষয়টিকে একটি পরামর্শ সভার আওতায় প্রেরণ করে। অতঃপর সে হিঃ ১৭১ সনে পিতার মৃত্যুর প্রায় একমাস পর উক্ত সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং আবাজিয়া ও অন্যান্য দল সমূহের উপর তার কর্তৃত্ব এতই দৃঢ় করে ফেলে যে, ইতিপূর্বে কোন আবাজী নেতার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সে ছিল ফক্বীহ, ধর্মবিশারদ ও সাহসী। নিজেই যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দান কারতো। তার অনেক সফল কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। দীর্ঘদিন পর তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, তবে, যারকালীর মতে তার মৃত্যু হয় হিঃ ১৯০ সনে। (২)

----

(১) দেখুন, উল্লেখিত গ্রন্থের ১৫০ ও ১৪০ থেকে ১৫২ পৃষ্ঠা।

(২) দেখুন, আল আ'লাম, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩৩-৪৩৩।

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় আমাদের কাছে প্রমাণিত হল যে, উপরোক্ত এই ফের্ক্বা সম্পর্কে ইতিহাসের পাতায় অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। শুধু ফরাসী লিখকদের পক্ষ থেকে নয়, স্বদেশী অনেক লিখকরাও যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার অংশবিশেষ আমরা জানতে পেরেছি, আবার এর অধিকাংশ আমরা জানতেও পারিনি।

এই আব্দুল ওহ্হাব রুস্তুমী সেই থার্ত শহরকে তার আধ্যাতিক কেন্দ্র বানিয়ে সুন্নী উলামাগণের সাথে বিবাদ-বিসম্বাদের পথ খুলে দেয়। এরপর সে শিয়াদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। এই শিয়ারা তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে ফাতেমী রাজত্যের গোড়া পত্তন করে এবং তাদেরই এক নেতা শিয়াপন্থী আব্দুল্লাহ হিঃ ২৯৬ সনে রুস্তুমী সম্প্রদায়ের পতন ঘটায়।(১) এর ফলে, রস্তুমী মতবাদের আক্বীদাহ সমূহের কার্যকারিতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যা ছিল আহলে সুন্নাহ ও জামাতের মত ও বিশুদ্ধ হাদীছের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোর পরিপন্থী।

এই আলাপ-আলোচনা থেকেই উক্ত ফের্ক্বা ও উহার আক্বীদাহ সম্পর্কে মরক্কোর উলামা ও ফক্বীহগণের গভীর ও মৌলিক অভিব্যক্তি উন্মোচিত হয়ে উঠে। সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থান্বেষী মহল

----

(১)'আলবায়ানুল মু'রিব ফী আখবারিল উন্দুলুস ওয়াল মাগরিব' ১ম খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা।এতে আব্দুল ওহ্হাবকে আব্দুল ওয়ারিছ নামে উল্লেখিত হয়েছে।

পরবর্তীতে মুসলিম সমাজে পারস্পারিক শত্রুতার আগুণ প্রজ্জ্বলিত করার কাজে উলামাদের এই গভীর অভিব্যক্তি ব্যবহার করে। তারা সেই কলুষিত ও বিকৃত পুরাতন পোষাক শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) ও তাঁর সংস্কারধর্মী বিশুদ্ধ সালাফী আন্দোলনের গায়ে পরিয়ে দেয়। এভাবে তারা এমন প্রতিটি আন্দোলনের প্রতি উহা আরোপ করতে থাকে যা মানুষকে পরিচ্ছন্ন ইসলামের প্রতি এবং আল্লাহ পাকের সত্যিকার দ্বীন প্রচারে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরবর্তীতে ছাহাবীগণের প্রথম ইসলামী যাত্রাভিযান অনুসরণের আহ্বান জানায়। এই ক্ষেত্রে তারা নতুন এই আন্দোলনের প্রতি মানুষের স্পর্শকাতরতাকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়, যে আন্দোলন আক্বীদাহ বিশুদ্ধ করণ এবং মানুষকে ইসলামের সেই প্রথম অবস্থানের দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আবির্ভুত, যে পর্যায়ে তিন শতাব্দী পর্যন্ত চলে গেল মুসলিম উম্মতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রথম দলটি। এতে না ছিল কোন কিছুর অনুপ্রবেশ, না ছিল নবপ্রবর্তিত কোন বিষয়ের সংযোজন; এমন দু-একটি ফের্‌কা ছাড়া যাদের ইসলাম থেকে দূরে থাকা সর্বজনবিদিত ছিল এবং এদের উপর সদাঅস্ত্রধারী হজরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে তাদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ সংগঠিত হয়। হজরত আলী (রাঃ)ও তৎপরবর্তী মুজাহিদগণ রিসালাতে মুহাম্মদীর পন্থা অনুসরণ করে বিভ্রান্ত ও ধর্ম থেকে বহির্ভূত এই সব ফের্‌কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান।

সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কারমূলক আন্দোলনের মুখোমুখী অবস্থান

ইসলামের শত্রুগণ তাদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ইসলামের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে চায় না। কেননা, তারা জানে, তাদের পক্ষ যুক্তি-প্রমাণের দিক দিয়ে দুর্বল এবং ইসলামের মোকাবেলায় বেশীক্ষণ টিকে থাকার মত নয়। তবে তারা ইসলামের প্রতি সম্বন্ধিত তথাকথিত একদল মুসলমানদেরকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, যাতে তারা এদের উপর নির্ভর করে আপন উদ্দেশ্যাবলী চরিতার্থ করতে পারে এবং তাদের নামে নানা রকম সংশয়-সন্দেহের অবতারণা উপস্থাপন করতে পারে।

খৃষ্টান ও ইসলাম বিদ্বেষী লোকগণ স্পেন, সিরিয়া এবং ইউরোপ ও উছমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্যান্য বহু ঘটনাবলীর আলোকে ভাল করেই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, নিরংকুশ পরিছন্ন ইসলাম তাদের প্রথম নম্বরের শত্রু। যে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে ও তার বিরোধী মতবাদ থেকে জাতিসমূহকে মুক্ত করতে আগ্রহী ও উৎসাহিত করে, এর মোকাবেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এতো হলো বিজয়ী ধর্ম। সুতরাং এর বিকৃতি, এর অনুসারীদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি ও তাদের পরিবেশে ফেতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ

ইংরেজগণ তাদের শ্রেষ্ঠ ও গর্বের উপনিবেশ সম্পদশালী ভারতবর্ষে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সালাফী আন্দোলনের প্রভাব ও প্রসার উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে। বিশেষ করে, যখন ভারতবর্ষের বহু লোক মুসলিম ধর্মপ্রচারক আহমদ ইবনে ইরফান (আহমদ বাচিলী) ও তাঁর অনুসারীগণের হাতে এবং অন্যান্য আন্দোলনের মাধ্যমে; যেমন, ফুরাতিফীন ও তিতুম্যান আন্দোলন (নাজার আলী), এই সালাফী দাওয়াত গ্রহণ করে।(১)

এসব আন্দোলন ছিল সেই কাফের কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, যে দলটির মাধ্যমে ইংরেজগণ তাদের হীন উদ্দেশ্য হাছেল করার জন্য ইসলামী নামের একটা অগ্রবর্তী প্লাটফর্ম তৈরী করে রেখেছিল এবং যে দলের অধীনে ছিল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নামধারী বহু মুসলমান।

----

(১) দ্রষ্টব্যঃ

ক–মোহাম্মদ কামাল জুম'আ কর্তৃক রচিত - 'আরব্য উপদ্বীপের বাইরে শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলন প্রচার' নামক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৩-৮৭।

খ–আমার দুটু প্রবন্ধ :একটি 'বাদশাহ আব্দুল আযীযের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্ক' শিরোনামে 'দার'ইয়া' ম্যাগাজিনের ১ম বৎসর ২য় ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত; দ্বিতীয়টি 'বাদশাহ আব্দুল আযীযের সাথে ভারতীয় আহলে হাদীছ জামাতের সম্পর্ক' শিরোনামে 'ফায়ছাল' ম্যাগাজিনে হিঃ ১৪১৯ সনের রমজান সংখ্যায় প্রকাশিত।

গ–ডঃ ছালেহ ইবনে আব্দুলাহ আল আব্বুদ রচিত 'শায়খমোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সালাফী আক্বীদাহ' নামক গ্রন্থ। মূদ্রণেঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইংরেজদের বিচলিত হওয়ার এবং শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য তাদের গভীর আগ্রহী হয়ে উঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই পথে তাদের বিরামহীন পরিশ্রম ও অগাধ মাল-সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে। কেননা, এই আন্দোলন দ্বীনে ইসলামের নবজাগরণ এবং উহার নিষ্কলুষ উৎস ক্বোরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মাধ্যমে উহা অনুধাবনের প্রতি আহ্বানের প্রতীক ছিল। বৃটিশ অফিসার ৪৭ নং ব্যাটালিয়ন প্রধান এবং ভারতবর্ষে বৃটিশসরকারের প্রতিনিধি 'সাদলার' কর্তৃক রিয়াদসফর তাদের উদ্দেশ্যকে আরো স্পষ্ট করে তুলে। তিনি বহুকষ্টে ভারত থেকে রিয়াদ পৌছেন এবং ইংরেজের যোগসাজসে পরিকল্পিত উপায়ে ইব্রাহীম পাশার অভিযানে বিধ্বস্ত দার'ইয়া শহরের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে আরব উপদ্বীপে নব জাগরণ সৃষ্টিকারী ইসলামী রাষ্ট্রের খানখান হওয়া এবং সালাফী আন্দোলনের ঘাঁটি পতনের উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কেননা, এই আন্দোলন ইংরেজ সরকারের অভ্যন্তরে স্বার্থের প্রতি হুমকি স্বরূপ দেখা দেওয়ার ফলে তাদের ভয় ও মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাদলারের এই সফরে তার বিরাট দলবলের মধ্যে তুর্কীরাই ছিল সংখ্যাধিক্য। এই সময় মুসলিম ঐক্যের প্রতি নবজাগরণ সৃষ্টিকারী উক্ত আন্দোলনকে নস্যাতের উদ্যোগ সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমনি, প্রকাশ করে ইসলামের প্রতি ইংরেজদের পরিকল্পিত ঘৃণা-বিদ্বেষ, যা ছিল

প্রাচ্যবিদদের বিকৃত চিন্তাভাবনার দ্বারা নির্দেশিত পাদ্রীদের পরিকল্পনা ও চক্রান্তের ফল।

সাদলার ১৮১৯ সালের অগাষ্ট মাসের ১৩ তারিখে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে দার'ইয়ায় উপস্থিত হন এবং মানসিক আত্মতৃপ্তি লাভের ইব্‌রাহীম পাশার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।(১) মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী আবইয়ারে আলী নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে সাদলার এই বিজয়ের জন্য ইব্রাহীম পাশাকে অভিনন্দন জানান এবং তাকে পূর্ব ভারতীয় ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত উপহার সমূহ প্রদান করেন।(২) এ হলো একদিক, অপরদিকে, তার এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের হত্যা ও হিঃ ১২৩৩ সনে নব্যমুসলিম রাজত্বের প্রধান ঘাঁটির আবসান সম্পর্কে বৃটিশ সরকারকে আশ্বস্ত করা। কেননা, মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি বৃটিশ উপনিবেশে এই আন্দোলনের প্রভাব দিনদিন বেড়ে চলছিল।

শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার উপর সাদলার বারবার শান্তনা ও স্বস্তির বাক্য ব্যবহার করেন। যেমন, একবার তিনি বলেছিলেনঃ দার'ইয়ার পতন ও আব্দুল্লাহর সেখান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে বাহ্যতঃ

---

(১) সাদলারের ভ্রমন কাহিনী, অনুবাদেঃ আনিস রেফা'য়ী, প্রতিপাদনেঃ সাউদ গানিম আল আজমী, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭ ও ৯৬-৯৯

(২) উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০৫-১১০ ও ১৫৬-১৫৯

ওহ্হাবীদের মূলোৎপাটন সাধিত হলো। নাজদ অঞ্চলে যত বেদুইনদের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে, দেখলাম, তারা সুন্নী মতবালম্বী এবং দীর্ঘ সফরে বা যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা ফরজ নামাজগুলো নিয়মিত আদায় করতে সর্বদা অভ্যস্ত ছিল।(১)

অতঃপর একই শহরের অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাদলার বলেনঃ বেদুইনরা ওহ্হাবী মতবাদের উপর কেবল জোরপূর্বকই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তা তখন হয়েছিল, যখন আন্দোলন শাক্তশালী পর্যায়ে ছিল এবং তাদের পক্ষে আবাধে লুটপাট করা সহজ ছিল। (২) অথচ সবাইর জানা রয়েছে যে, সাউদী রাষ্ট্র ১১৫৮ হিঃ সনে শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আল্লাহর শরীয়তী বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসন চালিয়ে যাচ্ছে ও চোরের হাত কাটছে। ফলে, রাস্তা-ঘাটে লোকের চলাচল নিরাপদ হয়ে উঠে। কেননা, এই রাষ্ট্র সর্বপ্রথম যে বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তন্মধ্যে লুটপাট এবং মানুষের উপর অক্রমণ তথা তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করা অন্যতম ছিল।

---

(১) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৪৯। (২) পূর্বোক্ত গ্রন্থ প্রষ্ঠা ১৫০

এতদ্ব্যতীত তার অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যেও পরস্পর বিরোধীতা, প্রকৃত অবস্থার বিকৃতি সাধন ও মানুষকে প্রতারিত করার অশুভ প্রচেষ্টা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর কারণসমূহ তার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, যখন আরব উপসাগর ও আরব সাগরে কাওয়াসিম নৌশক্তির আলোচনা তিনি করেন। এই কাওয়াসিমগণ সাগরপথে ভারতের বোম্বাই বন্দর শহরে পৌঁছে পূর্ব ভারতীয় ও বৃটিশ সরকারের অনেক যুদ্ধ জাহাজের উপর আক্রমণ করে। অন্য কাওয়াসিমদের সম্পর্কেও তার একই কথা, যারা এই ওহ্হাবী আন্দোলনকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিল। কেননা, সালাফী দায়াতের অন্যতম নীতি হলোঃ বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। যেহেতু তারা অমুসলিম, তাই তাদের অধিকার নেই কোন মুসলিম দেশে আধিপত্য বিস্তার করার। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের পক্ষে কাফেরদের আনুগত্য করা বৈধ নহে। মুসলমানদের উচিত তারা নিজেদের শাসন দায়িত্ব স্বয়ং পালন করা; যাতে তারা নিজেদের দেশে আল্লাহর শরীয়ত প্রবর্তন করতে পারে।

বৃটিশদের জন্য অশ্বস্তিকর এই বিষয় সম্পর্কে সাদলার তার গ্রন্থে অনেক কিছুই বলেছেন। এই ব্যাপারে ইব্রাহীম পাশার সাথে আলোচনা করেন এবং ইংরেজদের পক্ষ থেকে তার কাছে একটি পত্র বহন করে নিয়ে আসেন, যার মধ্যে কাওয়াসিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাথে জোট গঠনের আহবান জানান

হয়। গ্রন্থে পূর্ব আরবউপদ্বীপের সালাফী দাওয়াতের অনুসারীদের প্রতিরোধে বৃটেনের ভূমিকা কী হতে পারে, এই সম্পর্কেও আলোচনা করেন। কেননা, এই দাওয়াত মানুষের মনোবল ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে দিয়েছে, চিন্তার জগতে স্তবিরতার নিরসন করেছে এবং গভীর নিদ্রা থেকে তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছে।

বিভিন্ন অবস্থানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাদলারের দুশ্চিন্তা ও বিষোদগার স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে; যেমনঃ

১। ইয়ামানবাসী ও শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা। যেমন, তিনি এক স্থানে বলেনঃ ইয়ামেনের সর্ব শেষ ওহ্হাবী নেতার পতন হলে তথায় পাশা অর্থাৎ খলীল পাশার অবস্থান দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নেতার নাম হলো মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ, যাকে শৃংখলিত অবস্থায় হাবক নামক স্থানে নিয়ে আসা হয় এবং পরে সেখান থেকে জাহাজযোগে মিশর পাঠানো হয়।..........(ইয়ামন সম্পর্কে তার শেষ বক্তব্য পর্যন্ত) (১) এ ধরনের বক্তব্য একই উম্মতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অপপ্রয়াস বৈ কিছু নয়। এইভাবে ওমান ও আরব উপদ্বীপবাসীদের সম্পর্কে এমন এমন কথা তিনি বলেছেন যার মধ্যে বিভেদসৃষ্টির সুর নিহিত ছিল। অথচ আরব উপদ্বীপের সমস্ত

---

(১) পূর্বোক্ত তার গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫৩ ও ১৪৮

জনগণ ইসলামের ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে এবং তারা শরীয়তের দুই উৎস ক্বোরআন ও সুন্নাতের একই গাঁথায় গ্রথিত হয়ে আছে।(১)

২। সাদলার কর্তৃক ধর্মীয় কাজ-কর্মে অবহেলা প্রদর্শনকে সভ্যজীবনের অগ্রগতির প্রতীক এবং ইসলামের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতার নিয়মিত পালনকে আত্মার দাবী সমূহের সাথে পরস্পর বিরোধী বলে আখ্যায়িত করা। যেমন, নজদ এলাকায় বেদুইনদের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তারা এবাদত সমূহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আগ্রহী এবং কোন ফরজ নামাজের প্রতি তারা কোন অবহেলা করেনা, সফর যতই দীর্ঘ বা কষ্টকর হোক না কেন। কিন্তু তিনি যখন এই বেদুইনদের সাথে তুর্কীদের তুলনা করেন তখন তার বক্তব্যে আশ্চর্য রকমের গরমিল পরিলক্ষিত হয়। তার ভাষায়, তুর্কীরা সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অধিক অগ্রসর, তবে তাদের আরাম-আয়েশ ও স্বস্তির ক্ষেত্রে ধর্ম বা নামাজের বাধা প্রদানে তারা কখনও রাজী নয়।(২)

৩। মদীনাবাসীদের মর্যাদাহানির অপচেষ্টা এবং ভিক্ষুক ও লোভী ইত্যাদি পদবাক্যে তাদেরকে আখ্যায়িত করা। তিনি আরো বলেন, স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে তাদের দাম্ভিক হওয়ার কথা।

---

(১) পূর্বোক্ত তার গ্রন্থ প্রষ্ঠা ১০৮
(২) দেখুন সাদলারের-'আরব্য উপদ্বীপের ভ্রমন' পৃঃ ১৪৯।

তারা সাধারণতঃ হাজীদের দান-ছাদক্বার উপর জীবিকা নির্বাহ করে থাকে.........ইত্যাদি। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি তার ক্রুসেডী মৌলিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।(১)

৪। এরচেয়ে অত্যাধিক অশ্চর্য্যের বিষয় হলোঃ ইবরাহীম পাশা সম্পর্কে সাদলারের মন্তব্যঃ-

(ক) ইবরাহীম পাশা তার সাথে ইংরেজী পদ্ধতিতে পানাহার করেন। তার কাছে সাদলার আপন ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করেন এবং তাকে বৃটিশ উপহার ও চিঠিপত্র প্রদান করেন। এটা করা হয়েছিল রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সালামের উদ্দেশ্যে তার মদীনায় প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে। এতদ্ব্যতীত তার জন্য পেশ করা হয় চা, সিগারেট, সাউত, গালাইম ও কফির পিয়ালা ডায়মন্ড পাথরে খচিত ট্রের মধ্য করে। (২)

(খ) ইবরাহীম পাশা মূলতঃ মুহাম্মদ আলীর পালক পুত্র ছিল। যৌবনের শুরুতে সে ইস্তাম্বুলে এক বছর যাবৎ অবরোধ ছিল। কথিত আছে, এই ইবরাহীম পাশা তার পিতা-মাতার বিয়ের কয়েক মাস পরেই জন্ম গ্রহণ করেছে। সে ছিল মদ্যপানে অত্যন্ত আসক্ত এবং তার কাছে নিয়োজিত লোকদের প্রতি সে ছিল কঠোর স্বভাবের।(৩)

----

(১) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৬ ও ১১৮।

(২) দেখুন পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৬, ১০৯ ও ১১০।

(৩) দেখুন পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৭; বিস্তারিত দেখুন পৃঃ ১৩৭-১৪৩।

(গ) সাদলার অন্য এক স্থানে বলেনঃ ইবরাহীম-পাশা কোন কোন রাজ্যের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলো মাত্র। মুহাম্মদের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের পর খেলাধূলা ও মধ্যপান পরিত্যাগের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে। সে কায়রো থেকে আনিত এজাতীয় যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী বিনষ্ট করে দেয়। মদীনার পানে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই সে একাজগুলো সম্পাদন করে। (১)

দ্বিতীয়তঃ

এই ক্ষেত্রে ফরাসীদের ভূমিকাও ছিল লক্ষণীয়। তারা শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতের প্রতি উত্তর আফ্রিকায় গভীর আগ্রহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য *হলো ঃ*

মরক্কোর সুলতান সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলভী কর্তৃক মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতের প্রতি মনোযোগ প্রদান। তিনি বেদা'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, যেমন যুদ্ধ ঘোষণা করেন বিভিন্ন সূফী মতবাদের বিরুদ্ধে। তিনি সুন্নাতে রাসুল ও ইজ্তে-হাদের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান।(২) এই সাথে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার ও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আলভী সম্রাজ্যের সক্রিয়তা বিদ্যমান ছিল।

---

(১) দেখুন পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৭; বিস্তারিত দেখুন পৃঃ ১৩৭-১৪৩।

(২) শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতের প্রসার,পৃষ্ঠা ২৩৫, রচনায়- মোহাম্মদ জুম'আ কামাল, প্রকাশনায়- দারাহ

সালাফী দাওয়াতের প্রতি তাদের সমর্থন-সহযোগিতা এমন শক্তি সঞ্চার করে যা ফরাসীদের পর্যন্ত প্রভাবান্বিত করে ফেলে।

এই সুলতানের কথাই ফরাসী ঐতিহাসিক শার্ল জুলিয়ান এই বলে বর্ণনা করেন: "সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ, যিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও আল্লাহভীরু ছিলেন, মক্কায় আগত হাজীদের মাধ্যমে আরব উপদ্বীপে ওহ্হাবী আন্দোলনের বিস্তৃতি ও রাজকীয় সাউদী পরিবার কর্তৃক উহার সমর্থন ও সহযোগিতা সম্পর্কে খবর রাখতেন। তার কোন কোন বক্তব্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 'আমি মাজহাবের দিক দিয়ে মালেকী এবং আক্বীদাগত দিক দিয়ে ওহ্হাবী; তার এই উক্তিটি সর্বত্র বহুল প্রচলিত ছিল। তার ধর্মীয় আবেগ এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল যে, দ্বীনের ব্যাপারে নমনীয় এবং আশ'আরী মতবাদের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কিত বই-পুস্তকগুলো বিনষ্ট করে দেন এবং সুফীদের কোন কোন খানক্বাও তিনি ভেঙ্গে দেন।(১)

(২) এভাবে ১২২৬ হিঃ সনে মরক্কোবাসীদের একটি দল মরক্কোর সুলতান মাওলানা ইবরাহীম ইবনে সুলতান মাওলা সুলায়মানের সাথে হজ্ব পালন করে। আল-ইসতেক্বছা কিতাবের গ্রন্থকার তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন: তাদের জানামতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইবনে সাউদের পক্ষ থেকে শরীয়ত -

---

(১) উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩১১ দ্বিতীয় খণ্ড, রচনায়-শারলী জুলিয়ান

বিরোধী কোন কাজ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং তারা লক্ষ্য করেছেন, তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ধর্মের সঠিক অনুসরণ, ইসলামের নিদর্শন সমূহ, যথা- নামাজ, পবিত্রতা,রোজা,সৎকর্মের নির্দেশ, হরমাইন শরীফাইনকে বেদা'আত ও কুসংস্কার থেকে পরিস্কার করণ ইত্যাদি।(১)

(৩) ইমাম সাউদ ইবনে আব্দুল আযীয কর্তৃক তিউনিসবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি পত্র। এই পত্রে তিনি তাওহীদের হাক্বীকত ও দ্বীনের মূলনীতি সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এটি তিন পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপানো এক দীর্ঘ পত্র। এই পত্রটি এক জার্মান পত্রিকায় মরক্কোতে ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কে জনৈক প্রাচ্যবিদের জার্মান ভাষায় লিখা এক দীর্ঘ প্রবন্ধের একাংশ। তবে মূল পত্রটি আরবী ভাষায় লিখা ছিল। (২)

(৪)সুলতান সুলায়মান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুলাহ, যার হাতে ১২০৬ হিজরী সনে ফাস নগরে রাজকীয় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিনি ইমাম আব্দুলাহ ইবনে সাউদ ও তাঁর পিতা সাউদ ইবনে আব্দুল আযীয (যিনি হিঃ ১২১৭ সনে মক্কানগরে প্রবেশ করেন)-এর সমসাময়িক ছিলেন। সুলতান সুলায়মানের ইচ্ছা হলো, তিনি ইবনে সাউদ ও তাঁর

---

(১)আল ইসতেক্বছা, ১২২৬ হিঃ সনের ঘটনাপঞ্জী।

(২)দ্রষ্টব্যঃ জার্মান ম্যাগাজিন 'ইসলামিকা'। লেখক তার নোটে আন্দোলনের বিকৃতি সাধনকল্পে মূল পত্রে নেই এমন অনেক বিষয় জুড়ে দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদদের বেলায় এটা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। প্রথম সংখ্যা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭২, সন ১৯৫৩ইং।

দাওয়াত সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হবেন। তিনি তাঁর ছেলে মাওলা ইব্‌রাহীমকে মরক্কোর একদল উলামা ও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক সমভিব্যহারে হজ্জ মৌসুমে মক্কায় পাঠালেন। তাঁর সাথে পিতার পক্ষ থেকে ইবনে সাউদের নামে একটি জবাবপত্রও ছিল। তারা হিজায পৌঁছে প্রথমে হজ্ব সম্পাদন করেন, তারপর মদীনায় গিয়ে রাসুলুলাহ(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওজা শরীফ যিয়ারত করেন। সবকিছুই সম্পাদন করলেন শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সম্মানজনক আচরণের মধ্য দিয়ে। এই সম্পর্কে শায়খ আহম্মদ নাছিরী তার 'আল-ইস্তেক্বছা'নামক গ্রন্থের ১১৯-১২৩ পৃষ্ঠায় বলেনঃ সেই বৎসর মাওলা ইবরাহীমের সফরসঙ্গী হাজীদের অনেকেই আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, তারা আমীর ইবনে সাউদের পক্ষ হতে তাদের জানা মতে বাহ্যিক শরীয়তের বিপরীত কিছু দেখেননি। তারাতো তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে দেখেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে সঠিক আচরণ ও ধর্মীয় নির্দেশসমূহের যথাযথ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন; যেমনঃ নামাজ, পবিত্রতা, রোযা, অবৈধ হারাম বিষয় নিষিদ্ধকরণ এবং হারামাইন শরীফাইনকে ঐ সমস্ত ঘৃণ্য ও পাপকর্ম থেকে পবিত্র করা যা এর পূর্বে সেখানে অবাধে প্রচলিত ছিল।

এরপর যখন মাওলা ইবরাহীম মক্কার শরীফের সাথে একত্রিত হলেন তখন তিনি রাসূল বংশধরগণের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর সাথে তাঁর স্বীয় সাথীদের সমান আসনে

উপবেশন করালেন। তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফকীহ ক্বাজী আবু ইসহাক ইবরাহীম জার'য়ী। তাদের উদ্দেশ্যে ইবনে সাউদ যা বলেছিলেন তন্মধ্যে ছিল: মানুষ ধারণা করে, আমরা সুন্নাতে মুহাম্মাদীর বিরোধী। আপনারা আমাদেরকে সুন্নাত বিরোধী কোন কিছু করতে কি দেখেছেন? অথবা সাক্ষাতের পূর্বে আমাদের সম্পর্কে যা শুনেছেন তার কী-ই বা দেখলেন? তখন কাজী তাকে বললেন ঃ আমরা খবর পেলাম যে, আপনারা নাকি আল্লাহর সত্ত্বাগত বিরাজমান হওয়ার কথা বলেন, যাতে বিরাজমান সত্ত্বার শারীরিক বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। উত্তরে তিনি বললেন: আল্লাহর দোহাই, আমরাতো সে কথাই বলি, যে কথা ইমাম মালেক বলে গেছেন। তিনি বলেছেন: "বিরাজমান হওয়া জানা কথা, তবে এর ধরণ বা প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাত, এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বেদ'আত এবং এর উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব।" এর মধ্যে কি কোন বিরোধিতা আছে? তারা বললেন: না, আমরাতো এইরূপই বলে থাকি।

অতঃপর কাজী আবু ইসহাক আমীর ইবনে সাউদকে বললেন, আমরা শুনলাম, আপনারা নাকি বলেন: নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর নবী ভাইগণ (আলাইহিমুস সালাম) তাঁদের কবরে জীবিত নন? রাসূল (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর কথা শুনামাত্র ইবনে সাউদ কেঁপে উঠেন এবং উচ্চঃস্বরে তাঁর উপর দরূদ পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, আলাহর দোহাই, আমরাতো বলি ঃ

রাসূল (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) তাঁর কবরে জীবিত আছেন। এইভাবে অন্যান্য নবীগণও তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন। তাঁদের এই জীবন শহীদদের জীবনের চেয়েও উত্তম।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে গ্রন্থকার বলেন: 'আমি বলি, সুলতান মাওলা সুলায়মান (রহঃ)ও এ ধরণের মত পোষণ করতেন এবং এজন্য তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেন, যার মধ্যে তিনি তৎকালীন সূফীবাদ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেন এবং এর মধ্যে তিনি সুন্নাহ বহির্ভূত কাজ করা ও বেদ'আতে নিমগ্ন হওয়া থেকে লোকদের সতর্ক করে দেন, ওলীদের কবর যিয়ারতের আদব-কায়দা বর্ণনা করেন এবং এ ব্যাপারে সাধারণ লোকদের বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক থাকতে বলেন। এই সাথে মুসলমানদের নছীহতের বিষয়টির উপর কঠোরভাবে তাকীদ প্রদান করেন। (আল্লাহ তা'আলা তাকে সুপ্রতিফল দান করুন।)(১)

উস্তাদ মোহাম্মদ কামাল জুম'আ ইসলামিক ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া থেকে উদ্ধৃত করে বলেন: 'মাওলা সুলায়মান ১৮১০ সালের পর থেকে ওহ্হাবী মতবাদ সঠিক অর্থে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) এর সালাফী দাওয়াতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি মারবুতিয়া অর্থাৎ মরক্কোর

----

(১) দেখুন: 'শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতের প্রসার, পৃষ্ঠা ২৩৫-২৩৭, রচনায়- মোহাম্মদ কামাল জুম'আ, প্রকাশনায়- দারাহ এবং নাছিরী কর্তৃক রচিত 'আল ইসস্কেক্বা' ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০-১২২।

সুফী মতবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। (১)

(৫) এভাবে আব্বাস আল জারারী ১৩৯০ হিজরী সনে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে(২) প্রদত্ত তার বক্তৃতায় উলেখ করেন যে, এই সালাফী আন্দোলনের ধারা হিজরী চতুর্থদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুণরায় মরক্কো দেশে আবির্ভূত হয়, যখন প্রথম সুলতান হাসান হিঃ ১৩০০ সনে মরক্কো জাতির প্রতি এই সম্পর্কে এক বাণী প্রদান করেন। (৩)

(৬) আলজিরিয়ায় মুহাম্মাদ ইবনে আলী সানুসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সানুসী আন্দোলন সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাজার বর্ণনা করে বলেনঃ 'তিনি (মুহাম্মাদ) মক্কা শরীফে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালে এই সালাফী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন। তখন মক্কানগরী সাউদী রাজত্বের অধীনে চলে যায়। আলজিরিয়ায় সানুসীর এই সংস্কারধর্মী আন্দোলন ঠিক সেই ইসলামী সংস্কারধর্মী শিক্ষার আলোকে শুরু হয়, যার আলোকবর্তিকার দ্বারা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) আরব উপদ্বীপকে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। (৪)

---

(১) দেখুন পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩৭।

(২) এটিই বর্তমানে 'বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ' নামে পরিচিত।

(৩) দেখুন পর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৮ এবং 'আল ইস্তেক্বছা', পৃষ্ঠা ১১৯-১২৩,৮ম খণ্ড।

(৪) দেখুন 'মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব' নামক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭।

তৃতীয়তঃ মিশর

যে কোন পাঠক আব্দুর রহমান আল-জাবারতী (মৃত ১২৩৭ হিঃ) কর্তৃক লিখিত "আজাইবুল আছার ফিত তারাজিমি ওয়াল আখবার" নামক ইতিহাস গ্রন্থের উপর দৃষ্টি প্রদান করলে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবে। এক পর্যায়ে তিনি বলেনঃ "ওহ্হাবীদের সম্পর্কে মানুষ ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করছে। কেউ তাদেরকে খারেজী বলে, আবার কেউ তাদেরকে এর বিপরীত কিছু নামে আখ্যায়িত করে।" এরপর তিনি মাগরিবী দলের নেতার নামে লিখিত ইমাম সাউদের দাওয়াত ও আক্বীদাহর বর্ণনা সম্বলিত একটি পত্রের উলেখ করেন। ইমাম সাউদ তাঁর এই পত্রে মোটামুটিভাবে ধর্মীয় বিষয়গুলোর বর্ণনা দেন। এই সাথে শাফাআত, কবর তা'জীমের ফেতনা, কবর বাসীদের জন্য মানত করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, আল্লাহর কাছে মাধ্যম গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর তিনি বলেনঃ এর উপর আমি বলিঃ এই যদি অবস্থা হয় তাহলে এরই ভিত্তিতে আমরাও আল্লাহর দ্বীন পালন করি। এটিইতো হলো তাওহীদের সারকথা। মারিকীন বা পক্ষপাতদুষ্ট লোকেরা কি বলে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর কিতাব 'এগাছাতুল লাহফান, আল-হাফিজ মাক্বরিজী তার 'তাজরীদুত তাওহীদ' এবং ইমাম আলুসী তাঁর 'শারহুল কুবরা' নামক গ্রন্থসমূহে।(এখানে তিনি আরো অনেক

কিতাবের উলেখ করেন) বর্ণিত সবগুলো কিতাবেই পরিষ্কার নির্মল তাওহীদের হাক্বীকতের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখা হয়েছে যে তাওহীদই ছিল শায়খ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু।(১)

অন্যদিকে আল জাবারতী আলজিরিয়াবাসীদের সাথে ইংরেজদের কাহিনী প্রসঙ্গে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর প্রতি তাদের লোভাতুর দৃষ্টির কথা উলেখ করেন। আলজিরীয়াবাসীদের প্রতাপ প্রতিপত্তি কম ছিল না, তারা ইংরেজদের যানবাহন ও জাহাগুলো আক্রমন করে বহুল পরিমাণ গনিমত লাভ করে এং অনেক ইংরেজকে তারা বন্দী করে রাখে। এইভাবে তাদের হাতে ইংরেজরা ও অন্যান্য অনেক বন্দী ধরা পড়ে। এরপর ইংরেজ উসমানী সুলতানের এক ফরমানসহ অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বহু সামরিক জাহাজ নিয়ে উপস্থিত হয়। আলজিরিয়াবাসীরা সহস্রাধিক বন্দী মুক্ত করে দেয়। প্রতিটি বন্দীর বিনিময়ে তারা ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) রিয়াল গ্রহণ করে। এভাবে ইংরেজগণ যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যায়।

তবে কিছুদিন পর ইংরেজগণ আবার আলজিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। এবার তারা অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্ত করার জন্য অপর একটি উসমানী ফরমান নিয়ে আসে। আলজিরিয়া সরকার এবার অসম্মতি জানালো এবং তাদের সাথে বোঝাপড়া করতেও দ্বিধা

---

(১) দেখুন, 'আজাইবুল আছার' ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯-২৮২ ছফর হিঃ ১২১৮ সনের ঘটনাপুঞ্জী।

করতে থাকে। ইত্যবসরে ইংরেজগণ আরো অনেক জাহাজ নিয়ে আসে এবং অবাঞ্ছিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ আরম্ভ - করে দেয়। তারা আলজিরিয়াদের অনেক জাহাজ জ্বালিয়ে দেয়। এই সময় মরক্কোর সুলতান মাওলা সুলায়মান আলজিরিয়াবাসীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেন।(১)

চতুর্থঃ ইতালীগণ

মোহাম্মদ ইবনে আল-সানুসীর সংস্কারধর্মী আন্দোলন ইতালীয়দের অশান্ত করে ফেলে । তিনি হিঃ ১২০২ সনে আলজিরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার আন্দোলন শুরু হয় লিবিয়াতে। এর উদ্দেশ্য ছিল ঃ ইসলামকে তার নিষ্কলুষ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং মানুষের অন্তরে উহার সঠিক অবস্থান কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত করা এবং দখলদার ইতালীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান, যারা শুধু মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ লুট-পাট করতে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে অভ্যস্ত। (২)

এভাবে ছুমালী হাজীদের উপর এই আন্দোলনের প্রভাবও ইতালীদেরকে বিচলিত করে তোলে। আরব্যউপদ্বীপের নিকটবর্তী হওয়ার দরুণ আফ্রিকার ঐ সীমান্তেও এই দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। এর উপর মরক্কোর হাজীগণের উপর উক্ত

---

(১) দেখুন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ২৭৬-২৭৭, এতে আরো অধিক বর্ণনা রয়েছে।

(১) উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২০ দ্বিতীয় খণ্ড।

আন্দোলনের প্রভাব তাদেরকে আরো চিন্তিত করে তোলে। কারণ, তাদের মধ্যে নবনব নবায়নকারী ও সংস্কারকদের আবির্ভাব হতে চলছিল।

পঞ্চমতঃ

হল্যান্ডীয়গণ: যে সব মুসলিম দেশে তারা উপনিবেশ গড়ে তোলে সেখানকার মুসলমানদের সঠিক ধর্মের প্রতি নতুন করে ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ তাদেরকে নাড়া দেয়। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন, যখন দেখা যায় ইন্দোনেশীয়ার বিভিন্ন দ্বীপ যেমন, সুমাত্রা, জাভা, সুলো ইত্যাদির অধিবাসীগণ ইসলামী আক্বীদাহর প্রতি নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য প্রকাশ করছে। তারা উক্ত এলাকা থেকে আগত হাজীদের সংস্পর্শে এসে ইসলামী নিদর্শন গুলোকে পবিত্র তথা ইসলামী সমাজকে নিষ্কলুষ ও নিস্কলঙ্ক করার অপরিহার্যতা অনুভব করে। হাজীগণ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের নতুন সংস্কার ধর্মী আন্দোলনের গভীর পর্যালোচনা করে নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হন যে, কুরআন শরীফ ও সুন্নাতে রাসূল এর আলোকে আক্বীদাহ পরিশুদ্ধ করার এটাই সঠিক পদ্ধতি। উপরন্তু এতে দাওয়াতের পরিচ্ছন্নতা, সঠিক দিক্‌নির্দেশ, প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যাবলী থেকে বিমুক্ত হওয়ার সঙ্কল্প প্রতিয়মান রয়েছে।

সুতরাং তারা স্থির বিশ্বাসের সাথেই এই দাওয়াতের বাণী স্বদেশে বহন করে নিয়ে যায়। ফলে, সেখানে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে এই দাওয়াতের কাজ চলতে থাকে। তন্মধ্যে একটি

হলোঃ মুহাম্মদী এসোসিয়েশন, জাকার্তা। এই সংস্থা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সংযোজিত কুসংস্কার ও বেদ'আত বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাম্প্রদায়িক আহবানে ভাটা পড়ে যায়। যারা ইসলামের নামে ইসলামী সমাজে বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ও বেদ'আতকে উৎসাহিত করে দলাদলী ও ফেতনা সৃষ্টির অনুকূলে তাদের দর্শন "বিভক্ত কর এবং শাসন কর" বাস্তবায়িত করতে চায়।

সেখানে এই দাওয়াতের প্রভাব-প্রসার শুরু হয় ইং ১৮০৩ সন মোতাবেক হিঃ ১২১৮ সন থেকে, যখন হল্যাণ্ডবাসীদের বিরুদ্ধে সেখানে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এই আন্দোলন ১৬ বৎসর পর্যন্ত চলতে থাকে। পরিশেষে, শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতে প্রভাবিত একত্ববাদী সালাফীগণের উপর সম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (১)

এছাড়া মুসলিম বিশ্বের বহু দেশে মক্কায় আগত হাজীদের মাধ্যমে এই দাওয়াতের সুফল পৌঁছে যায়। কেননা, তারা এর মধ্যে দেখতে পায় সংযোজিত বিভিন্ন প্রকার পঙ্কিলতা থেকে ইসলামের মুক্তি এবং সেই জালেম সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে দেশের পরিত্রাণ

---

(১) দ্রষ্টব্য- শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব, রচনায়ঃ আহমাদ ইবনে হাজার, পৃষ্ঠা-১০৬

নিহিত, যারা মুসলমানদের আক্বীদাহ বিনষ্ট করতে সদা সচেষ্ট। এই উদ্দেশ্য সাধনে তাদের প্রচারিত কুটকৌশল ও খ্রীষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক মুসলমান দের খৃষ্টান বানানোর গভীর আগ্রহ কার্যকরী ছিল। এই সঙ্গে নাস্তিক্য ও অন্যান্য বিভ্রান্ত মতবাদী সম্প্রদায়ের প্রচারকরাও অত্যন্ত সক্রিয় ছিল, যাতে মুসলমানগণ তাদের স্বীয় ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধর্মীয় সেই মূল্যবোধ থেকে দূরে থাকে, যে মূল্যবোধ আলোকিত ও মুক্ত বুদ্ধিমত্তাকে সত্যের প্রতি সদা আহবান জানায়।

তাই, এই দাওয়াতী আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের ব্যাপক সাড়া জাগে সুদান, মিশর, সিরিয়া, ইয়ামন, ভারত, আফগানিস্তান, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, নাই জিরীয়া, আফ্রিকার হাওসা ভাষাভাষী দেশগুলো, বর্ণিও, তাকরুর দেশগুলো ও অন্যান্য অঞ্চলে। এই দেশগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় ঐসব লোকের লিখায় যারা শায়খ মোহাম্মদের জীবন-চরিত ও মুসলিম বিশ্বে উহার প্রভাব সম্পর্কে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন। কেননা, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁর আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে মনোবল জাগিয়ে দেয় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে তাদেরকে সক্রিয় করে তুলে। চিন্তার ক্ষেত্রে জাগরণ সৃষ্টি করে এবং ব্যাপক ভাবে সঠিক নির্ভেজাল ধর্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধনে গভীর ও উদার আগ্রহের সৃষ্টি করে। যেমন, ইমাম মালেক (রহঃ) এই

অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। মূলতঃ এই বিষয়টিই উপনিবেশবাদীদের গায়ে কাঁপন সৃষ্টি করে এবং এই আন্দোলন ও উহার নীতি-মালা গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের অনুভূতিকে সক্রিয় করে তুলে। (১)

----

(১) ইমাম মালেক (রহঃ)এর উক্তি ছিলঃ "শেষ যুগের উম্মতকে কেবল সেই ধর্ম-বিশ্বাসই সংশোধন করতে পারে যা প্রথম যুগের উম্মতকে সংশোধন করেছিল" আর একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রথম যুগের উম্মতকে ইসলামই সংশোধন করেছিল।

উছমানী সাম্রাজ্য ও ওহ্হাবী আন্দোলন

কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় ও তুর্কী লোক এবং আফ্রিকার কয়েকটি দল শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতে প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি সিরিয়া, মরক্কো, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের মুসলিম চিন্তাবিদগণ কর্তৃক উহার প্রতি ঐকান্তিক গুরুত্ব প্রদানের ফলে উছমানী সম্রাজ্যের উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ ও স্বার্থান্বেষী ও পদলোভী মহলগুলো বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠে। এরাই উছমানীদের কাছে এই দাওয়াত সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য বিকৃত করে উপস্থাপন করে এবং হজ্ব মৌসুমে কোন কোন আরব বেদুঈনের আচরণকে স্বার্থ সিদ্ধির পথে সম্বলরূপে ব্যবহার করে। এভাবে তারা উক্ত আন্দোলনের প্রতি লোকদের ঘৃণা ও সন্দেহের উদ্রেক করে, যাতে সাধারণ লোকের মধ্যে এর বাহক ও প্রচারকারীদের সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভব সৃষ্টি হয় এবং তারা এমন অনেক বিষয় বানিয়ে-সাজিয়ে প্রচার করে যার কোন অস্তিত্বই ছিলনা।

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের চিঠিপত্র ও তার ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে আমরা উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনসূচক দিকগুলোর স্পষ্টতা প্রমাণ করতে পারি এবং এই সাথে তাঁর দাওয়াতের হাক্বীকত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে অনেক মুসলমান কর্তৃক তাঁর কাছে প্রেরিত অনেক পত্রের উত্তরগুলোও তা প্রমাণ করে; যেমন:

১। শায়খ মুহাম্মদ (রহঃ) কর্তৃক সিরিয়ার এক গ্রামীণপ্রধান শায়খ ফাজিল আলে মিজয়াদ এর নামে লিখত পত্রঃ

এই পত্রে শায়খ মুহাম্মদ বলেনঃ "এই পত্র লিখার কারণ, রাশেদ ইবনে 'ইরবান আমার কাছে আপনার সম্পর্কে উত্তম কথা বলেছে, যা আমার মনঃপুত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, আপনি আমার দিক থেকে পত্র লেখালেখির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই কারণে যে, আমার সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা ও অপবাদ আপনার কাছে পৌঁছানো হয়েছে। আপনার মত লোকের পক্ষ হতে এই ধরনের উত্তরই যথোপযুক্ত। কেননা, কোন কথা প্রতিপাদ্য না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় না।"

এরপর তাকে যা বলা হয়েছিল তিনি তার ব্যাখ্যা শুরু করেন এবং এই ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য আল্লাহর শরী'আত ও রাসূল(ছালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম)-এর হেদায়াত মোতাবেক বিশ্লেষণ ও উহার জবাব প্রদান করেন।(১)

২। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ইরাকের বিশিষ্ট আলেম শায়খ আব্দুর রহমান সুয়াইদীর নামে লিখিত এক পত্রে বলেনঃ

---

(১) শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের রচনাবলীর ৫ম খণ্ডে ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় পূর্ণ পত্রটি দ্রষ্টব্য, প্রকাশনায়-ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ।

‘আপনার মনোভাব সম্বলিত পত্রখানা আমার হাতে পৌঁছেছে। আল্লাহ আপনাকে মুত্তাকীনদের একজন ইমাম এবং সাইয়্যিদুল মুরসালীনের দ্বীনের প্রতি একজন আহবানকারী বানিয়ে দিন। আমি আপনার অবগতির জন্য উল্লেখ করছি যে, আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে আমি সুন্নাতে রাসূলের একজন অনুসারী, কোন নব প্রবর্তক নই। আমার আকীদা ও ধর্ম যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পালন করছি, তা হলো সেই মাজহাব যার উপর আহলে সুন্নাত ও জামায়াত প্রতিষ্ঠিত এবং যার উপর মুসলমানদের ইমামগণ, বিশেষ করে চার ইমাম সহ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীরা অবস্থান করছেন। আমি শুধু লোকদের স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহর জন্য ধর্ম-কর্ম খালেছ করতে এবং নিষেধ করছি জীবিত বা মৃত নেক লোক ও অন্যান্যদের কাছে প্রার্থনা জানাতে। আর আল্লাহর এবাদতে, যেমন জবাই, মানত, তাওয়াক্কুল, সিজদা ও অন্যান্য বিষয় যা আল্লাহরই হক্ব, তাতে যেন তারা আল্লাহর সাথে কোন নিকটতম ফেরেস্তা বা তার কোন প্রেরিত রাসূলকে শরীক না করে। এই বিষয়ের প্রতিই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব নবী-রাসূলের আহবান কেন্দ্রীভূত ছিল। এরই উপর আমরা সুন্নী জামাত প্রতিষ্ঠিত।(১)

(৩) মক্কা শরীফের বিশিষ্ট ওলামাগণের প্রতি লিখিত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব(রহঃ)

---

(১) শায়খ মোহাম্মাদের রচনাবলী, প্রকাশনায়- রিয়াদস্থ ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৮ এবং আদ দুরারুস সানিয়্যাহ,পৃষ্ঠা-৫৪-৫৬

এর পত্র। এই পত্রে তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের দিগনির্দেশনাগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। এতে তিনি যা লিখেছিলেন তন্মধ্যে তার এই বক্তব্য রয়েছে:

'আমাদের উপর যে ফেতনা আপতিত হয়েছে তা আপনারা বা অন্যান্যরা জানতে পেরেছেন। এর কারণ হলো, আমাদের দেশে নেক লোকদের কবরের উপর নির্মিত গম্বুজরাশির ধ্বংস সাধন। যখন বিষয়টি জনসাধারণের কাছে বড় আকারে দেখা দিল এ কারণে যে, তাদের ধারণায় এই কাজ মৃত নেক লোকদের প্রতি অসদাচরণের শামিল। তা সত্ত্বেও আমরা লোকদের মৃত নেক বান্দাহগণকে ডাকতে নিষেধ করি, বরঞ্চ আমরা তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকতে বলি। যখন আমরা কবরের উপর নির্মিত সমাধির ধ্বংসসহ এই বিষয়টি জনসমক্ষে প্রমাণ করি, তখন জনসাধারণের উপর এর বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ইলমের দাবীদার অনেক লোক নানা কারণে এই যোগসাজসে সহায়তা করে, যা আপনাদের মত লোকদের কাছে অজানা নেই। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, জনগণ কর্তৃক স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। এই সাথে আরো অনেক কারণ রয়েছে। তখন তারা প্রচার করলো যে, আমরা নেক লোকদের গালি দিচ্ছি এবং আমরা উলামাবর্গের পথে চলি না। তারা বিষয়টি পূর্ব-পশ্চিম সবদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং আমাদের সম্পর্কে এমন এমন বিষয় উল্লেখ করেছে যা কোন বুদ্ধিমান লোক উচ্চারণ করতেও লজ্জা

বোধ করবে। আমি আপনাদের সেই বিষয়ে খবর দিচ্ছি, যার উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি। এই ব্যাপারে মিথ্যা বলার কোন অবকাশ আমার নেই। কারণ, আপনাদের মত ব্যক্তিবর্গের কাছে এমন লোকদের মিথ্যার রেওয়াজ চলতে পারে না, যারা সাধারণ-অসাধারণ সবাইর সম্মুখে নিজেদের মাজহাব প্রকাশ করে বেড়াচ্ছে। আল-হাম্‌দু লিল্লাহ! আমরা অনুসরণকারী, নব নব বিষয় উদ্ভাবনকারী নই। আমরা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাজহাব অনুসরণ করে চলছি। তারা আমার প্রতি এমনও অপবাদ প্রচার করছে যে, আমি ইজতেহাদের দাবী করি এবং ইমামদের অনুসরণ করি না।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ ধ্বংস করা এবং মৃত নেক লোকদের কাছে প্রার্থনা থেকে নিষেধ না করা সালাফে ছালেহীনদের নীতির পরিপন্থী। আমি আল্লাহপাক, তাঁর ফেরেস্তাবর্গ ও আপনাদেরকে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের দ্বীনের উপর সাক্ষী রেখে বলছিঃ আমি আহ্‌লেইলমদের একজন অনুসারী। কোন সত্য আমার জান না থাকলে অথবা কোন ভুল করে থাকলে আমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিন। আমি আল্লাহপাককে সাক্ষী রেখে বলছি আমি তা নতশিরে মেনে নিব। অসত্যের উপর অবিচল থাকার চেয়ে সত্যের পানে প্রত্যাবর্তন করা উত্তম মনে করি। (১)

----

(১) পূর্বোক্ত তার গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪০-৪২

৪। মদীনা মুনাওয়ারার একজন আলেমের নিকট প্রেরিত তাঁর একটি পত্র। এই পত্রে তিনি বলেন:

'আপনার পত্র আমার হাতে পৌঁছেছে, আল্লাহপাক আপনাকে তাঁর সন্তুষ্টির অঙ্গনে পৌঁছিয়ে দিন। পত্র পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এই জেনে যে, আপনারা কুশলেই আছেন। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে যদি জানতে চান তা হলে বলছি: আল্‌হামদু লিল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার প্রশংসায় সব নেক কাজ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। আর আমাদের ও লোকজনের মধ্যে মতবিরোধের কারণ জানতে চাইলে বলি যে, ইসলামী শরীয়তের কোন বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ নেই; যেমন: নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব ইত্যাদি। এমন কি শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন বিষয়েও আমাদের মধ্যে বিরোধ নেই। আমাদের কাছে যা ভাল মানুষের কাছেও তা ভাল।(১)

এগুলো ছাড়া শায়খ মোহাম্মাদের আরো অনেক পত্রাবলী রয়েছে। উছমানী সাম্রাজ্য অজ্ঞতার কারণে মুসলিম বিশ্বে তাদের নেতৃত্বের প্রতি হুমকির আশঙ্কায় এই দাওয়াতের প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে, তারা স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে

----

(১) পূর্বোক্ত তার গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৯, এর মধ্যে রয়েছে আহলে সুন্নাত ও জামাতের আক্বীদাহর পূর্ণ বিবরণ।

দেয়। অন্যদিকে, তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যাতে মুসলমানদের দুর্বল করে সেই সংস্কারমূলক আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারে যা মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও ঐক্য সৃষ্টি করছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রাসূল মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার কারণ-উপকরণসমূহ খতম করে দিচ্ছে। উছমানী রাজত্বের এসব কর্মকাণ্ডের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল দ্বীনে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এবং তাদের প্রবৃত্তি ও মনোবাঞ্ছনা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশাবলীর চেয়ে অধিক প্রিয় তাদের পার্থিব স্বার্থ এবং স্বস্ব পদমর্যাদা বিলুপ্ত হওয়ার আতঙ্ক।

এর দ্বারা একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শত্রু লাভবান হয়, অপরদিকে, যেহেতু মুসলমান তার ধর্মবিরোধী সেই সাম্রাজ্যবাদীকে চায়না যে সে তার আক্বীদাহ সম্পর্কিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক। নতুবা তাদের দূরভিসন্ধি ও চক্রান্ত ফাঁস হয়ে পড়বে এবং পুণরায় মুসলমানদের সাথে তাদের নতুন ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

এজন্য পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের -তাদের সাথে ইয়াহুদীদের অবস্থানও উড়িয়ে দেওয়া যায় না- চরম ও পরম লক্ষ হলো ইসলামের উপর আঘাত হানা। তাদের এই পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তখন থেকেই

জারী রয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করে মদীনায় অবস্থান শুরু করেছিলেন। ইতিহাসের পাঠকবর্গ এরকম অনুভূতির প্রমাণ পাবে মদীনার মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর জবিনচরিত্রে এবং ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এর কার্যক্রমে। শেষোক্ত লোকটি ইসলামে প্রবেশ করেছিল শুধু ইসলামকে ভিতর থেকে ধ্বংস করার এবং দুর্বল জ্ঞান-সম্পন্ন লোকদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। ইসলামে এই লোকটিই সর্বপ্রথম 'সাবাইয়া' নামে একটি দলের জন্ম দান করে।

এবিষয়টির ঈঙ্গিত আমরা পাই প্রাচ্যবিদদের অধ্যয়ন ও লিখালিখিতে, যারা সর্বদা লোকদের মন-মগজে ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বর্তমান যুগে ইসলামের চিত্র বিকৃত করার এবং ইসলামের চিন্তাধারা ও ইতিহাসে নানা প্রকার ভ্রান্তি প্রবেশ করানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের অধিকাংশই ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোক।

এইসব প্রাচ্যবিদরা ইতিহাসের পাতা উল্টাতে থাকে এবং অতীতের ঘটনাবলী নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে থাকে। এই আশায় যে, হয়ত এমন কোন বিষয় পাওয়া যেতে পারে যা তথাকথিত আলেমনামধারী ও প্রবৃত্তির অনুসারী ঐসব লোকদের পক্ষে সন্তোষজনক হয়, যাদেরকে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন ইসলামী পদে বসিয়ে গোপনে গোপনে পিছন থেকে তাদের পরিচালনা করে এবং তাদের ইচ্ছামত

উপায়-উপকরণ শোভণীয় করে যোগান দেয়। সেসব লোকও তাদের অন্তর্ভূক্ত, যারা পরকালকে পার্থিব স্বার্থে বিক্রি করে ফেলে। এরা সবাই একটা উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে রয়েছে যা তারা সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত করতে চায়।

ফলশ্রুতিতে এরা সাধারণ লোক এবং অর্ধশিক্ষিত লোকদের - যারা সঠিকভাবে পড়াশুনা করে না বা যা পড়ে তার গভীরে যায় না এবং এধরনের লোকই ছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ - এই ধারণা দেওয়া হলো যে, আরব উপদ্বীপে এই যে নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে এটাতো সেই আন্দোলনেরই প্রলম্বিত রূপ যা এর পূর্বে মরক্কো দেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল। হে মুসলমানগণ, এটা সেই আবাজিয়া খারিজী ফের্কা যা তোমাদের মাজহাব ও আক্বীদাহর ঘোর পরিপন্থী।

এই দাবী ও বিভ্রান্তিকে দলীলভিত্তিক প্রলেপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ও তাঁর অনুসারীদের উপর নানাবিধ অপবাদ আরোপ করে। শায়খ মোহাম্মদ তাঁর বিভিন্ন চিঠি-পত্র ও বই-পুস্তকে এগুলোর স্পষ্ট বিবরণ ও জবাব দেন। মরক্কোর আলেমগণও হিঃ ১২২৬ সনে তাদের বিতর্ক অনুষ্ঠানে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, মাওলা আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে সুলতান মাওলা সুলায়মান (রহঃ) একদল মরক্কোবাসী ওলামাদের নিয়ে সেই বৎসর হজ্জ করতে আসেন এবং ইমাম সাউদ ইবনে

আব্দুল আযীযের সাথে তাদের প্রতি আরোপিত বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্কে বসেন। এটা ছিল শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) এর মৃত্যুর অনেক বছর পর।

মরক্কোর ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহে এই ঘটনা অর্থাৎ উক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরদ্বারা এই সংস্কারমূলক সালাফী আন্দোলনের প্রতি আরোপিত যাবতীয় অপবাদ সমূহের অসারতা এবং আন্দোলনের বিশুদ্ধতা ও সততা সম্পর্কে মরক্কো দেশের উলামাবর্গের পরিতুষ্টি প্রমাণ করে। শেষ পর্যন্ত মাওলা ইবরাহীমও এই সম্পর্কে পরিতুষ্টি লাভ করেন।(১)

সাম্রাজ্যবাদীদের এই অপবাদ অর্থাৎ এই আন্দোলনের প্রতি তাদের দুর্নাম ও অপবাদ আরোপ নেতৃত্বপিপাসু ও কর্তৃত্বলোভী তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বজা ধারী মহল এবং প্রবৃত্তির অনুসারী ও বাহ্যিক স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীর অন্তরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

এহলো একদিক, অপরদিকে শায়খ মোহাম্মদের পিতা আব্দুল ওহ্হাবের প্রতি আন্দোলনের নামটি সম্বন্ধিত করা হলো। এটাতো ঠিক নয়। কেননা, তিনিতো আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন না।

---

(১)মরক্কোর ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে মাওলা আবু ইসহাক্ব ইবনে সুলায়মানের জীবন-চরিত দ্রষ্টব্য; যেমন-'আল ইসতেসক্বা', পৃষ্ঠা-১২০-১২৫, ৮ম খণ্ড এবং 'আল এ'লাম' পৃষ্ঠা-৬৮-৭৩, দশম খণ্ড।

আর যদি তারা আন্দোলনের সম্বন্ধ শায়খ মোহাম্মদের প্রতি আরোপ করতো তা হলে মোহাম্মদী আন্দোলন বলা হতো, তবে এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। কারণ পুরা দ্বীনে ইসলামকে মোহাম্মদী রিসালত বলা হয়ে থাকে রাসূল মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সম্বন্ধ করে, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এর বার্তা পৌঁছিয়েছেন।

সাধারণ মানুষতো এটা-ওটার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নির্দ্ধারণ করে না। সেজন্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত আরোপ করা এই নামটির দ্বারা জনগণের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠে। এই জনগণই হলো তাদের সংশয়-সন্দেহের বেড়াজাল সৃষ্টির ঘাটি এবং অর্ধ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি বাস্তবায়নের ক্ষেত্র সৃষ্টির পটভূমিকা।

এধরণের ষড়যন্ত্রের কথাবার্তা মিশরের গভর্ণর মোহাম্মাদ আলীর নামে এবং কোন কোন উছমানী শাসকবৃন্দের কাছে প্রেরিত ইবরাহীম পাশার বিভিন্ন রিপোর্ট ও পত্রাবলীতে প্রকাশ পেয়েছে। তখন থেকেই শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ও সাউদী রাষ্ট্রের উপর ওহ্হাবিয়া, খাওয়ারিজ, ধর্মদ্রোহী ইত্যাদি নাম আরোপ করা শুরু হয়। (১)

এরা সবাই বাহ্যত একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আর তা হলোঃ এই আন্দোলনের ব্যাপারে জনগণকে বিভ্রান্তির

মধ্যে নিক্ষেপ করা। স্বভাবতঃ সাধারণ লোক যে কোন নতুন বিষয়ের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ থাকে এবং প্রচলিত বিষয়ের পরিপন্থী যা দেখে তা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এর সর্বোত্তম উদাহরণ আমরা পাই পবিত্র কোরআন মজীদে বর্ণিত ও রাসূল করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনে সংঘটিত বহু ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুগণের ভূমিকায়, যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পথে আহবানকারী ও মানবজাতির উদ্ধারকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এভাবে বর্তমান যুগেও আমরা এর জীবন্ত উদাহরণ দেখতে পাই। যখন মুসলিম যুবকরা তাদের ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রভু-প্রতিপালকের বিধি-নিষেধ ও শিক্ষার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে থাকে, যাকে ইসলামী জাগরণ নামে আখ্যায়িত করা হয়, তখনই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলোসহ তাদের চিন্তাবিদরা এর চিত্রকে বিকৃত ও সেই গতিধারার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করে এবং এই ইসলামী পট পরিবর্তনকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করতে থাকে; যাতে এর মাধ্যমে উক্ত গতিধারায় বাধার সৃষ্টি হয় এবং এর উৎসাহ-উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

----

(১) এই নথি-পত্রগুলো দেখুনঃ মোহাম্মদ আলীর পত্র, যার মধ্যে তিনি ইবনে সাউদের বিরদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য তুর্কীদের কাছে ওজর পেশ করেন- পৃঃ ৩৫৩-৩৫৫; আলে সাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কিত ইউসুফ কাবাখের বিশেষ পত্র, পৃঃ ৩৬২-৩৭০; ইউসুফ জাবা পাশাকে হিজাযের জেনারেল কামাণ্ডার হিসেবে নিয়োগপত্র-পৃঃ৩৮১-৩৮২ এবং পরিশিষ্ট-পৃঃ ৩৮৩-৩৮৪; শাক্বরাযুদ্ধ ও উহা বিজয়ের সুসংবাদ সংক্রান্ত ইবরাহীম পাশার পত্র, পৃঃ৪২২-৪৪৪ ইত্যাদি। এই বিষয়ে আরো দেখুন-ডঃ আব্দুর রহীম আব্দুর রহমানের লিখা 'সাউদী রাষ্ট্র' মূদ্রণেঃ আরব লীগ পৃঃ ৩৪৯-৪৪০ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড = উছমানী সম্রাজ্যের নথি-পত্র।

সর্বকালে এবং সর্বযুগে সাধারণ লোকগণ, যারা হলো সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এজাতীয় বিষয়ে কোন শক্তিশালী উৎসের আশ্রয় নিয়ে থাকে যা তাদেরকে স্পষ্ট করে প্রকৃত বিষয়টি বিশ্লেষন করে বলে দেয়। কিন্তু তৎকালীন আলেম-উলামা ও স্বার্থান্বেষী মহলের এই উৎসটি প্রকৃত তথ্যটি পাল্টিয়ে দেওয়ার পক্ষে এবং আন্দোলনের প্রতি সাড়া প্রদানকারী অবহিত লোকদের দুর্নাম করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। তাদের কাজ ছিল, সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা এবং বানোয়াট মতামতের যোগান দেওয়া, যা সংবাদ সংস্থা ও প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে জনগণ সহজেই গ্রহণ করে নিত। অন্যদিকে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে রূখে দাড়ানোর আহবানের প্রতি সমর্থন প্রদানের প্রয়াস চলছিল। এই আন্দোলনকে তারা ধর্মে ভাঙ্গন ও বিভক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম জামাত থেকে বের হওয়ার নামান্তর ও ধর্মে নব্য প্রবর্তিত বিষয় বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার ছিল এর বিপরীত।

প্রচারিত ও আরোপিত এই সংশয়-সন্দেহ উছমানী সাম্রাজের উচ্চ পর্যায়ে নিয়োজিত স্বার্থান্বেষী ও প্রভাবশালী মহলে বিপুল সাড়া পায়। তারা সম্রাজ্যের সুনাম, অবস্থান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। বিশেষ করে, তারা মদীনা ও ইয়াম্বুর মধ্যবর্তী ছাফ্‌রা প্রান্তরে উছমানী বাহিনীর পরাজয় বরণের পর ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে সাউদ এর উপর তাদের কোন এক সুলতানের মাতার সম্ভ্রমহানী সংক্রান্ত অপবাদ ছড়ানোর এবং

হজ্জ ব্যতিরেকে উছমানী ক্বাফেলার প্রত্যাবর্তনের পর আরো তীব্র আকার ধারণ করে। উক্ত ক্বাফেলায় উপরোক্ত সুলতানের মাতা ও তার সঙ্গী-পরিচারিকারাও ছিল।

এভাবে তাবেদার বহু মুসলিম দেশে অনেক লোক এই অপবাদ ও দুর্নাম ছড়িয়ে দেয়, যারা জনগণের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় আত্মসাত করে, সাময়িক ধর্মীয় নেতৃত্বে সন্তুষ্ট থাকে এবং এরদ্বারা তারা অজ্ঞ লোকদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে, যারা তাদের দ্বীনের হক্বীকত সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত নয় এবং তারা সেই সব লোকের নিয়ত সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে না বা ওরা কি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাও তারা জানেনা। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলেমের এই পদস্খলন ও পথভ্রষ্ট উলামাদের এই ভ্রান্তি সম্পর্কে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। যারা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত ফাত্ওয়া প্রদান করে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করে। (১)

এরা সবাই মানবজীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থনলীতে স্পর্শ করলো; আর সেটা হলো তাদের ধর্ম, যার প্রতি অন্তরাত্মার অনিবার্য প্রয়োজন রয়েছে এবং যার প্রতি তাদের অন্তরাত্মার আগ্রহ সুবিদিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার হাক্বীকত তাদের জানা নেই;

---

(১) বুখারী, মুসলিম ও তিরমিজী শরীফে আয়েশা ও উরওয়া (রাজিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ থেকে।

জানা নেই এর উৎসগুলো, যেখান থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারা মেনে চলবে।

উপরোক্ত এই পটভূমিকা থেকেই আন্দোলন-বিরোধীদের পারস্পারিক সহযোগিতা শুরু হয়। তাদের উদ্দেশ্য, এই আন্দোলনকে জনসমক্ষে বিকৃতভাবে চিহ্নিত করা, যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলোঃ মুসলমানদের এক পতাকার নীচে সমবেত করা, কুসংস্কার বর্জন করা। কেননা, জ্ঞানই হলো সব হাক্বীকতের উৎস। ইবনে গান্নাম ও বিশর কর্তৃক তাদের ইতিহাসের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায়, দার'ইয়া নামক স্থানে জ্ঞান আহরণের প্রতি মানুষের বাধভাঙ্গা আগ্রহের জোয়ার সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে তাদের মধ্যে জীবিকার্জনের জন্য বিরামহীন কাজ কর্মের উদ্যোগও জেগে উঠে। শায়খ মোহাম্মাদের ছাত্ররা তাদের দৈনন্দিন সময়টুকু জ্ঞান অর্জন ও কাজ-কর্মের মধ্যে বিভক্ত করে রাখতেন।

তারা ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত হতেন এবং তারপর তারা কৃষি কাজসহ বিভিন্ন কাজকর্মে জোহর পর্যন্ত নিয়োজিত থাকতেন। এরপর একটু বিশ্রাম নিয়ে আছরের নামাজের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতেন। মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞান সভায় যোগদান এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎ ও পাঠচক্রে জ্ঞানচর্চা, আলাপ-আলোচনা ও গবেষণায় লিপ্ত থাকতেন।

প্রতিপক্ষের সংশয়-সন্দেহ

এভাবে বহু লোক শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের দাওয়াতের সাথে নিজেদের স্বার্থের সংঘর্ষ বাধার কারণে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে এবং নানা উপায়ে তাঁর উপর মিথ্যা ও অপবাদের প্রলেপ সাধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ লোক ছিল তাঁর আপন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এরা শায়খ মুহাম্মাদ ও তাঁর সংস্কারমূলক আন্দোলন সম্পর্কে বহু কথা ও গল্প রচনা করে, যেগুলোর প্রতিবাদ তিনি তাঁর বিভিন্ন বই-পুস্তক ও চিঠিপত্রে অপনোদন করার চেষ্টা করেছেন। এইসব পত্রে তিনি বিভিন্ন অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেন এবং স্বীয় আক্বীদাহ-বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, তিনি কোন ব্যাপারেই কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে যাননি। আমি এখানে তাঁর বিরোধীলোকদের মধ্যে কারো কারো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় লিপ্ত হবো, যাতে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানকারীর পক্ষে মূল ব্যাধির স্থানসমূহ নির্ণয় করা সহজ হয়।

শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনবিরোধী লোকগণ যে সব মিথ্যা ও অপবাদের অবতারণা করেছে উহার যে কোন পাঠক উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা যে সমস্ত সংশয়-সন্দেহ ও বিতর্কিত বিষয়সমূহের উপস্থাপনা করেছে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের লিখালিখিতে

এসবের কোন অস্তিত্বের প্রমাণ নেই। বরং তাঁর বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা ও তাঁর ছাত্র ও সন্তান-সন্ততি কর্তৃক বিপুলহারে প্রণীত গ্রন্থাদি উপরোক্ত সমূহ অবাস্তব বক্তব্য নাকচ করে দেয় এবং সত্যিকার ঈমান সহকারে তা থেকে বিমুক্ত দাবী করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঐসমস্ত পুস্তিকা ও জবাবী পত্রাবলী যেগুলোতে পাঠকবৃন্দ এই আন্দোলন ও উহার বাহকদের সম্পর্কে জানতে পারে যে, তারা কিভাবে আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকে ভিত্তিহীন সন্দেহ ও অপবাদগুলো প্রত্যাখ্যান করে আসছেন এবং যা থেকে শায়খ মোহাম্মদ তাঁর প্রতি আরোপিত অপবাদ থেকে সত্যিকার ঈমানের সাথে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। ঐসব পত্রাদি ও প্রশ্নোত্তর গুলোই এর জলন্ত প্রমাণ। এই সংস্কারমূলক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনাকারী এবং ভিত্তিহীন সংশয়-সন্দেহের প্রত্যাখ্যানকারীগণ এগুলো সম্পর্কে সহজেই অবগত হতে পারবে। আর এই সংশয় সন্দেহের প্রবাহ তার রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রথম থেকে শুরু হয় এবং অদ্যাবধি তা চলছে।

আমরা যখন এই সব সংশয়-সন্দেহের মূল কারণ তালাশ করতে যাই তখন এগুলোকে নিম্নলিখিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে পাই :

১। এমন অনেক সন্দেহ আছে, যার গোড়া রয়েছে পূর্ববর্তী কোন কোন ধর্মীয় দলে। এগুলোকে তারা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহহাবের গায়ে জুড়িয়ে দেয়। অথচ এগুলো সম্পর্কে শায়খ

মোহাম্মদের যে অভিমত তাই হলো সুন্নী জামাতের অভিমত। এরদ্বারা ইসলামের কাতার থেকে বের হওয়া তিনি অস্বীকার করেন, যেমন অস্বীকার করেছেন এর পূর্বে সিরিয়ায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), মরক্কোতে ইমাম শাতিবী (রহঃ) ও মিশরে ইজ্জ ইবনে আব্দুস সালাম(রহঃ-৬৬০ হিঃ)

২। অন্যান্য বিবিধ বিষয়গুলো, যার পিছনে সত্যতার কোন ভিত্তি নেই এবং তা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব বা তাঁর ছেলে ও ছাত্রদের রচিত গ্রন্থের মূল উদ্ধৃতিতে সেগুলোর কোন উল্লেখ নেই।

বানোয়াট বিষয়ের তো কোন সীমা নেই। পাঠক ও শ্রোতার উপর এর প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। শায়খ মোহাম্মাদের লিখিত বই-পুস্তক এর বিপরীত অনেক কিছু স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশে প্রেরিত তার চার-চারটি পত্রের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে আমরা তাঁর উপর আরোপিত অপবাদ থেকে বিমুক্ত হওয়ার কথা এর পূর্বে অনুধাবন করে নিয়েছি।(১) এগুলো ছিল স্পষ্ট অপবাদ, যার আক্বীদাহগত বা মৌখিক কোন ভিত্তি নেই। উদাহরণস্বরূপ ক্বাছীমবাসীদের প্রতি লিখিত তাঁর এক পত্রে দেখা যায়, তিনি বলেছেনঃ

'অতঃপর, আপনাদের কাছে অবিদিত থাকেনি

---

(১) দেখুন, এই গ্রন্থের ১২২-১২৬ পৃষ্ঠা এবং পার্শ্ব-টীকায় পত্রগুলোর উৎস সমূহ।

যে, আমি জানতে পেরেছি, সুলায়মান ইবনে সুহাইমের পত্র আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছে (১) এবং আপনাদের এলাকায় তথাকথিত নামধারী কয়েকজন আলেম তা গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং বিশ্বাসও করে ফেলেছেন। আল্লাহ পাকই বেশী জানেন। লোকটি আমার উপর এমন এমন অনেক বিষয়ের অপবাদ আরোপ করেছে যা আমি মোটেই বলিনি। এর অনেক বিষয় তো আমার ধারণায়ও আসেনি। তন্মধ্যে তার অপবাদ হলো ঃ আমি চার মাযহাবের কিতাবগুলো বাতেল করে দিয়েছি এবং আমি নাকি বলেছি যে, ছয়শত বছর থেকে মানুষ কোন সঠিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি এবং আমি নিজে মুজতাহিদ হওয়ার দাবী করি। আমি তাক্বলীদ মানি না। আমি বলি, আলেমগণের এখতেলাফ শাস্তি স্বরূপ, যারা নেকলোকদের ওসিলা গ্রহণ করে তারা কাফের, আমি বুছাইরীকে এই কথার উপর কাফের বলি যে, তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করে বলে ছেন:'হে সৃষ্টির সেরা দয়ালু'; আমি বলেছি, যদি আমার সাধ্য হত রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের উপর নির্মিত গম্ভুজ ধ্বংস করে দিতে তা হলে তা ধ্বংস করে দিতাম, যদি আমার সাধ্য হত কাবা শরীফের বর্তমান মিজাব নামিয়ে

----

(১) সুলায়মান ইবনে সুহাইম রিয়াদবাসী জনৈক ব্যক্তি, যে এই দাওয়াতের বিরোধীতা করে এবং বিভিন্ন এলাকাবাসীর নিকট এমন এমন বক্তব্য ও অপবাদ লিখে পাঠায় যা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) কখনও বলেননি।

কাঠের মিজাব বসাতাম। আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারত হারাম মনে করি, আমি পিতামাতার ও অন্যান্যদের কবর যিয়ারত পছন্দ করি না, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করে আমি তাকে কাফের বলি, আমি ইবনুল ফারিজ ও ইবনে আরবীকে কাফের বলি এবং দালাইলুল খাইরাত ও রাওজুর রাইয়াহীন (আমি নাকি এর নাম দিয়েছি রাওজুশ শায়াতীন) নামক গ্রন্থদ্বয় পুড়িয়ে ফেলি!

উপরোক্ত এইসব বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার জবাব হলো:

سبحانك ، هذا بهتان عظيم

"হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে বলছি: এটা হলো এক জঘন্য অপবাদ।"

এর পূর্বেও অনেক লোক ছিল যারা হজরত মোহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অপবাদ দিয়ে বলেছিল যে, তিনি ঈসা ইবনে মারয়াম (আলাইহিসি সালাম) কে গালি দিতেন এবং নেক লোকদেরও গালি দিতেন। সুতরাং মিথ্যা ও অপবাদ রটনায় ওদের এবং এদের আন্তরিক সাদৃশ্য রয়েছে।' (১)

---

(১) এই পত্রের পূর্ণ বিবরণ দেখুন: শায়খ মোহাম্মাদের গ্রন্থপুঞ্জি ৫ম খণ্ড, ব্যক্তিগত পত্রাবলীর অধ্যায়-পৃষ্ঠা ৮-১৩ এবং অত্র বইয়ের সংশ্লিষ্ট।

(৩) উপরোক্ত উভয় অবস্থায়ই শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের অনুসারীদের সাথে বিতর্কে অবতরণকারী লোকদের অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। তাদের এই অক্ষমতাকে ঢেকে রাখার মানসেই তারা শায়খ ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে নানাবিধ অপবাদ রটনা শুরু করে। যাতে লোকদের মধ্যে অবিশ্বাস ও সংশয় সৃষ্টি হয়। যদি তারা আলাপ-আলোচনার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ্য বলে দেয় তা হলে তাদের মর্যাদা ও স্বার্থসম্ভার ক্ষুন্ন হয়ে যায়। তাই, তাদের সম্মুখে সত্যকে বিকৃত করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না। কেননা, যা আলোচিত হয়েছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

(৪) শায়খ মোহাম্মদ (রহঃ) এর মূল বক্তব্যের অসম্পূর্ণ বাক্য অথবা তাঁর বক্তব্যের ভিন্ন মর্মার্থ পেশ করা; যেমন, কেহ (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ)'মুছাল্লিদের জন্য ধ্বংস' পড়ে এর পরবর্তী অংশ পড়া থেকে বিরত থাকে। এর মধ্যে তাদের একথাও অন্তর্ভুক্ত যে, মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের অনুসারীরা রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ পাঠ অস্বীকার করে এবং তাঁর রেসালাত অগ্রাহ্য করে। এজাতীয় কথা কোন চক্ষুষ্মান বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বিশ্বাস করতে পারে না।

অসম্ভব নয় যে, যারা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ও তার আন্দোলনের উপর আক্রমণ করেছেন তাদের কেহই শায়খ মোহাম্মদের কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেনি। তাওহীদ, আকীদাহ, ফেক্বাহ,

আহ্কাম, তাফ্সীর ও সীরাতের উপর লিখিত তার একটি লিখাও তারা পড়েনি। এমনকি, তাঁর কোন বক্তব্য সম্পর্কে তারা একটু পর্যালোচনাও করেনি। তাদেরকে সক্রিয় করেছে কেবল পার্থিব স্বার্থাদি এবং অন্ধ করে রেখেছে তাদের প্রবৃত্তি। তারা তাৎক্ষণিক একটা সুযোগ পেয়ে গেল। রুস্তুমী ওহ্হাবী ও খারিজী আবাজী, যাদের সম্পর্কে ওলামায়ে ইসলাম যা বলার বলেছেন। তাদের সম্পর্কে মরক্কো দেশে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বহু ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে। মরক্কো ও স্পেনের উলামাবর্গ তাদের গ্রন্থসমূহে বহু জবাব প্রতিজবাব লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তারা এই কলঙ্ক ও কালিমাসমূহ প্রথম লগ্নেই শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের এই নতুন আন্দোলনের গায়ে লাগিয়ে দিল।

শায়খ মোহাম্মদের বিরুদ্ধবাদীরা নামের সাদৃশ্য পনার সুযোগ নিয়ে উভয় অবস্থার উপর তা প্রয়োগ করলো এবং প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির উপর আরোপ করে দিল। এভাবে তারা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের উপর এক নূতন পরিভাষার প্রলেপ এঁটে দিল। মুসলমানদের মধ্যে এই নামের একটা গভীর প্রতিক্রিয়া বিরাজমান রয়েছে। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকায় ওহবিয়াহ বা ওহ্হাবিয়াহ নামের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। ফলে, এই লোকজন পূর্ব থেকে প্রস্তুত এই লেবাসটি মানুষের কাছে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য শায়খ মোহাম্মদের আন্দোলনের গায়ে পরিয়ে দিল এবং

পূর্ববর্তী ওহ্হাবিয়া মতবাদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি খুটিয়ে খুটিয়ে প্রকাশ করে এবং সেগুলো শায়খ মোহাম্মদের এই বিশুদ্ধ আন্দোলনের গায়ে চাপিয়ে দেয়।

ইতিহাস মরক্কোবাসীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা সর্বদা আহলে সুন্নাতের বিপরীত ভ্রান্ত আন্দোলন সমূহের বিরুদ্ধে প্রশংসণীয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। এই আব্দুল ওহহাব ইবনে রস্তুম, তারপর ফাতেমী সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের সাথে তারা মোকাবেলা করেছেন। পরিশেষে, তারা তাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবেলা করেছেন এবং ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

সুতরাং আন্দোলনের শত্রুরা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সালাফী আন্দোলনের গায়ে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এই বিকৃত রূপক নামের লেবাসটি পরিয়ে দেয়। তাদের ভয় ছিল, এই আন্দোলনের ফলে মুসলমানগণ সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী মুহাম্মদী জীবন-পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, যারা ইতিমধ্যে দলাদলী ও বিচ্ছিন্নতায় ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে, তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির এবং যে বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের সুযোগে শত্রুদের অনুপ্রবেশ ঘটে তা পরিহার করার পরিবেশ তৈরী হয়ে যাবে।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল

ওহ্হাবের আন্দোলন উদারভাবে গ্রহণ করে এবং সেখানকার লোকেরা উহাকে স্বাগত জানায়। কেননা, প্রত্যেক মুসলমানেরই তা কাম্য। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে কয়েকটা উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতি স্বার্থান্বেষী মহল এবং কুসংস্কার প্রিয় ও প্রবৃত্তির অনুসারী লোকদের অস্থির করে তোলে। তারা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে এই আন্দোলনকে নিস্তব্ধ করার লক্ষ্যে উঠেপড়ে লেগে যায় এবং এই আন্দোলন থেকে লোকদের বিমুখ ও উহার উৎসগুলো সম্পর্কে গবেষণা-অনুসন্ধান থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

এভাবে প্রতিটি দেশ, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে লিখিত ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয় ও জার্মান তথা পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ লেখকগণের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধে উক্ত বিষয় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশেষ করে, যখন তারা ইসলামের ইতিহাসে কোন নুতন চিন্তাধারায় জাগরণের সম্মুখীন হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এই জাগরণের সম্পৃক্তি, সর্বদা সত্যিকার পর্যালোচনায়, শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলন ও মুসলিম বিশ্বে উহার প্রসারের সাথে জড়ানো হয়ে থাকে। কারণ, এই আন্দোলন তখনই আবির্ভূত হয়েছিল যখন চতুর্দিক অজ্ঞতা ও অত্যাচারের কালো মেঘ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই সময় মুসলমানগণ সালাফী দাওয়াতের হক্কীকত অনুধাবন শুরু করে, যা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) নবায়ন করেন এবং উহা মুসলমানদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী জীবন-পদ্ধতি ও নিরংকুশ ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশ্বাসগত ও চিন্তাগত জাগরণ পুনর্বহাল করে দেয়। কারণ, এই আন্দোলন ইসলামকে উহার প্রথম যুগের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা থেকে বাইরে নিয়ে যায়নি। তিনি ইসলামের ইতিহাসে সংস্কারকগণের কর্মপন্থা ও সালাফে ছালেহীনদের নবায়নপদ্ধতির উপর আমল করেন। যেমন করেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম (মৃতঃ দামেস্ক ৭২৮ হিঃ), ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়া (মৃতঃ দামেস্ক ৭৯০ হিঃ), আল-ইজ্জ ইবনে আব্দুস সালাম (মৃতঃ মিসর) প্রমুখসহ আরো অনেক সালাফী আলেমগণ।

এই সম্পর্কে বহু আরব ও মুসলমান বিজ্ঞ ও চিন্তাবিদ লোকসহ আরো অনেকেই আলোকপাত করেছেন। ওস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে রুওয়াইশিদ তার লিখিত ইতিহাস "ঈমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব" নামক গ্রন্থে প্রায় চল্লিশটি অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব অভিমতে শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলন ও পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে মুসলমানদের অন্তরে জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উহা যে ভূমিকা পালন করেছে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। (১)

---

(১) দেখুন, তাঁর উক্ত গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৩০০-৩৬০

পুনরায় সংশয়-সন্দেহ ছড়ানোর প্রয়াসঃ

সমগ্র বিশ্ব, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব কয়েকটি জঘন্য মতবাদের দ্বারা চরমভাবে আক্রান্ত হয়; যেমন, সমাজতন্ত্র, মাসুনিয়া, অস্তিত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে এই ভ্রান্ত মতবাদ সমূহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এবং নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছার জন্য পরিচ্ছন্ন, নিষ্কলুষ এবং সংযোজন ও বেদ'আত থেকে পবিত্র খালেছ ইসলাম ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

কারণ, মুসলমানদেরকে আল্লাহপাক প্রকৃতিগত ভাবে আনুগত্য প্রিয় এবং আল্লাহর পানে ধাবমান সঠিক আক্বীদাহর প্রতি আগ্রহী করে সৃষ্টি করেছেন। এটিই সেই প্রকৃতি, যার উপর আল্লাহ পাক মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি তাদেরকে আকর্ষণ করে এবং সেই বন্ধন তাদের পরস্পরকে একত্রিত করে। ফলে, তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে পারস্পারিক আকর্ষণ থাকার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক নৈকট্য সাধিত হয়। কিন্তু পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য সম্পন্ন ও গভীর বিদ্বেষপূর্ণ বিভিন্ন মহল, মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিহীন হওয়ার সাথে সাথে তারা দুর্বল বুদ্ধিসম্পন্ন সাময়িক উদ্দেশ্য অর্জনে আগ্রহী ও স্বল্পজ্ঞানী লোকদের নিজস্বার্থে ব্যবহার করতে অগ্রসর হয়। তখন তারা জ্ঞানের নামে কথা বলতে

থাকে এবং অভিমান-ঐতিহ্যের নামে নেতৃত্ব প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমাদের প্রিয় রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতের উপর ভ্রান্ত উলামাদের পক্ষ থেকে এই বিষয়টিরই আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, যারা লোকদের সম্মুখে বিভিন্ন বিষয়কে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়।

এ বিষয়টি আমাদের কাছে ধরা পড়ে তখনই যখন বই-পুস্তক ব্যাপক আকারে ছাপা শুরু হয় এবং নতুন করে বিনা মূল্যে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই বই-পুস্তক মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় সংশয়-সন্দেহের জন্ম দেয়। অথচ মুসলমানগণ তা প্রায় ভুলে গিয়ে নতুন করে আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত জীবন-পদ্ধতি ও বিশ্বস্ত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের উপর একত্রিত হতে যাচ্ছিল। আর তাও নানাবিধ ফেতনা-ফ্যাসাদের ঝড় সৃষ্টি এবং ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে শত্রুদের যাবতীয় কলা-কৌশল প্রয়োগের পর। মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনকে যাবতীয় অনুপ্রবেশকৃত বিষয় থেকে পবিত্র ও মুক্ত রাখা। পক্ষান্তরে, ঈর্ষাপ্রবণ খৃষ্টান ও প্রতারণাবাজ ইয়াহুদীরা তাদের সাহায্যকারী ও সহযোগীদের অগ্রসর হতে নির্দেশ প্রদান করে। কেননা, তারা মুসলিম দেশের চেয়ে অমুসলিম পাশ্চাত্য দেশে স্বীয় সত্ত্বা প্রায় হারাতে বসেছিল। স্বধর্মীরা পর্যন্ত উহার আন্দোলনকারীদের চিন্তার জগতে শুন্যতা ও সঠিক পথে চলার যোগ্যতা নিয়ে বিদ্রোহ করে বসে।

এরপর তারা আপন সহযোগীদের আরো সক্রিয় করে তুললো, যখন তারা দেখলো মুসলমান যুবকরা দিনদিন নির্মল ও বিশুদ্ধ ইসলামের পানে ধাবিত হচ্ছে। যেমন, আফ্রিকার একজন মুবাল্লিগ আমাকে সেখানে এবং প্রতিটি স্থানে লোকজনের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ও সঠিক উৎসসমূহ থেকে ইসলামী শিক্ষা অনুসন্ধান করার প্রতি গভীর আগ্রহের কথা জানালেন।

উক্ত মুবাল্লিগ আমাকে যা বলেছেন তন্মধ্যে একটি ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটা হলোঃ

'আফ্রিকার জনৈক আলেম শায়খ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে লিখিত ঐসব বই-পত্র পাঠ করে প্রভাবিত হয়ে পড়েন, যেগুলো বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিভিন্ন ভাষায় ছেপে বন্টন করা হয়। ফলে, তিনি শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ও তাঁর সংস্কারমূলক আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুরু করেন এবং বিরোধীদের বই-পুস্তকে বর্ণিত তাঁর সংস্কারমূলক দাওয়াত ও তাঁর উত্তরসূরীদের উপর আরোপিত নানা ধরনের অপবাদ ও সংশয়-সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁকে মন্দ ভাষায় আখ্যায়িত করতে থাকেন। একদা সেই মুবাল্লিগ উক্ত আলেমকে বললেন, আপনি কি শায়খ মোহাম্মদের লিখিত কোন বই-পত্র পড়েছেন? তিনি উত্তর দিলেনঃ না! পড়িনি, তবে তার সম্পর্কে যা শুনেছি তা-ই যথেষ্ট। মুবাল্লিগ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 'কিতাবুত তাওহীদ' নামক শায়খ মোহাম্মাদের বইখানার গেলাফ খুলে ফেলেন

এবং উক্ত আলেমের হাতে গেলাফহীন অবস্থায় দিয়ে বললেন:অনুগ্রহপূর্বক এই বইখানা পড়ে আগামীকাল এর উপর আপনার অভিমত আমাকে জানাবেন।

পরদিন নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎ হলে মুবাল্লিগের সম্মুখে উক্ত আলেম কিতাবখানার ভুয়ষী প্রশংসা করেন এবং উহার লিখকের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। কেননা, এর মধ্যে যা বলা হয়েছে তা কোরআন ও সুন্নাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম) দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিপাদিত এবং এর মধ্যে যেসব দিগনির্দেশ রয়েছে মুসলমানদের পক্ষে তাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাস সংশোধনে উহার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

সাথে সাথে মুবাল্লিগ সাহেব গেলাফসহ কিতাব খানার একটি কপি সেই আলেমের হাতে তুলে দিয়ে বললেন: জনাব, এই কিতাবের লিখকই সেই মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব, যিনি হলেন সেই সংস্কারবাদী সালাফী আন্দোলনের প্রবক্তা। তাঁর অন্যান্য বই-পুস্তকও এরূপ।

তখন সেই আলেম কোন উপায়ান্তর না দেখে বলতে বাধ্য হলেন: 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম অভিভাবক। সত্যিই শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবকে এমন এমন বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে যা তাঁর মধ্যে ছিলনা। তাঁর সম্পর্কে আমরা যা পড়েছি তা এই কিতাবের বিপরীত। এটাই তো খালেছ তাওহীদ, যা

নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।'

অবশেষে, উক্ত আলেম আমাদেরকে এই তাওহীদের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার নছীহত করেন।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষেও এরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে জনৈক আল-বকরী নামে একজন লোকের মাধ্যমে ঐরূপ এক সাক্ষাৎকারে প্রখ্যাত এক ভারতীয় আলেমকে আল্লাহ পাক হেদায়াত দান করেন।

এটি হলো সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলমানদের উচিত, এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর পুরাপুরি অবগত না হয়ে কোন বিষয়ে একের উপর অন্যের মতামত যেন চাপিয়ে না দেওয়া। ধর্ম ও আক্বীদাহ সংক্রান্ত বিষয়ের হক্বীকৃত প্রকাশ ও উহার উপর মতামত প্রদানের পূর্বে মুসলমানের কর্তব্য বিষয়টির ব্যাপক পর্যালোচনা ও উহার উৎস অনুসন্ধান করে দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে উহার প্রতিপাদন করা। যাতে এই ব্যাপারে তার পদস্খলন না ঘটে এবং সেজন্য মুসলমানদের মধ্যে অবাঞ্চিত কোন মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়। আর এই মতবিরোধের দ্বারা কেবল ইসলামের শত্রুরাই উপকৃত হয়। কেননা, তারা মুসলমানদের বিভক্তি ও তাদের মধ্যে মতবিরোধ

সৃষ্টির জন্য দিনরাত পরিশ্রম ও সম্পদ ব্যয় এবং নিজেদের মন-মস্তিষ্ক ও সহযোগীদের ব্যবহার করতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেনা। তাদের বিশ্বাস, মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিতেই তাদের স্বার্থসিদ্ধি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে যথার্থ সফলতা নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তিনি যেন মুসলমানদের মধ্যে এই শেষ যুগে একতা, পারস্পারিক সম্প্রীতি ও আন্তরিক সৌহার্দ্য দান করেন, যেভাবে তাদের দান করেছিলেন ইসলামের প্রথম যুগে। আল্লাহ পাক এই সম্পর্কে তার নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অবহিত করে বলেন:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: "এবং আল্লাহ তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা-আন্ফাল, আয়াত-৬৩)

ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ মুসলমানদের উপর কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না ওরা মুসলমানদের ধর্মাদর্শ বিনষ্ট করতে পারবে এবং তাদেরকে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও ঝগড়া-বিবাদে

সর্বদা লিপ্ত রাখবে। যেমন, আল্লাহ পাক তার পবিত্র কোরআনে এই অনুভূতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলেনঃ

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

অর্থঃ "ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করবে। বল, 'আল্লাহর পথ-নির্দেশই প্রকৃত পথ-নির্দেশ।' (সূরা-বাক্বারা, আয়াত-১২০)

আর এটা ধ্রুব সত্য যে, শেষ যুগের এই মুসলিম উম্মত কেবল সেই নীতি-মালা ও জীবন-পদ্ধতির মাধ্যমেই সংশোধিত হতে পারে, যার মাধ্যমে প্রথম যুগের উম্মত সংশোধিত হয়েছিল; যেমন ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছিলেন। সন্দেহ নেই, প্রথম যুগের উম্মত নির্মল পরিচ্ছন্ন ইসলামী আক্বীদাহর মাধ্যমেই সংশোধিত ও উন্নত হয়েছিল। সুতরাং শেষ উম্মত কেবল উহারই মাধ্যমে সংশোধন ও উন্নতি লাভে সক্ষম হতে পারে।

স্বদেশের অভ্যন্তরে আন্দোলনের বিরোধিতা

যে এলাকা থেকে শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সংস্কারমূলক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সে অঞ্চলে উহা সর্বপ্রথম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তথাকথিত আলেম নামধারী কিছু লোক এর সম্মুখে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদের এমন অনেক স্বার্থ ছিল, যা প্রকৃত সত্য জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়লে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, যে সত্য তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি *ওয়া সাল্লাম*) এর হাদীছের আলোকে লোকদের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রচার করতে সচেষ্ট ছিলেন।

প্রবৃত্তি মানুষকে সচরাচর অন্ধ ও বধির করে রাখে। সেইভাবে বিরোধিতার ক্ষেত্রে হিংসা-বিদ্বেষের ভূমিকা ও উপেক্ষা করা যায়না। এক আরবী কবি বলেন ঃ

حسدوا الفتى إذ لم يكونوا مثله فالقوم أعداء له وخصوم

অর্থ: "তার মত হতে পারেনি বিধায় তারা যুবকটিকে হিংসার পাত্র বানালো, ফলে সমগ্র সম্প্রদায় তার শত্রু ও বিরোধীপক্ষ হয়ে সেজে বসলো"

স্বদেশে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, লোকগণ শায়খ মোহাম্মাদের দাওয়াতকে কঠোর সমালোচনা, মিথ্যা ও অপবাদের দ্বারা কোণঠাসা

করতে লাগলো। তাদের স্বার্থের অপমৃত্যু হবে, এই ভয়ে তারা বিচলিত হয়ে চক্রান্ত ও ঘৃণা সম্বলিত বিষাক্ত চিঠি-পত্র ডানে-বামে চতুর্দিকে পাঠাতে শুরু করে।

ইবনে সুহাইম, ইবনে মুওয়াইস ও অন্যান্যদের কর্মকাণ্ডে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে এদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে। তাদের বহুল প্রচারিত অনেক পত্রাবলীর ঈঙ্গিত মিলে শায়খ মোহাম্মাদ কর্তৃক প্রেরিত তাঁর বহু চিঠি-পত্রে, যেগুলো তিনি স্বীয় দাওয়াত ও উহার প্রকৃত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে চতুর্দিকে যেমন পাঠিয়েছিলেন, তেমনি তিনি এসব পত্রে পূর্ব থেকে মানুষের মন-মানসিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মিথ্যা ও অপবাদ অপনোদনের চেষ্টাও করেছিলেন।

এখানে আমরা ঐসব লেখা-লেখি ও পত্রাবলীর মোকাবেলার গভীরে আপাততঃ যাব না। আল্লাহ পাকের সেই চিরন্তন বাণীকে স্মরণ করাই আমরা যথেষ্ট মনে করবো। আল্লাহপাক বলেন ঃ

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

অর্থ: "অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে।" (সুরা রাদ-১৭)

অবশেষে, সমালোচক, সমালোচিত এবং অপবাদ কারী ও যারা অপবাদের শিকার হয়েছে তারা সবাই তো চলে গেল এবং সময় প্রমাণ করলো, শায়খ মোহাম্মাদের সততা ও নিষ্ঠা। চতুর্দিকে তাঁর দাওয়াতের গুঞ্জন রয়ে গেল। বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেলো। সর্বত্র মানুষ তাঁর লিখিত বই-পত্রের অধ্যায়ন ও অনুধাবনে আগ্রহী হয়ে উঠলো। উপরন্তু অনেক বিরোধী লোকও দাওয়াতের বিশুদ্ধতা ও সততায় চক্ষুষ্মান হয়ে সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করলো। কেননা, 'সত্য বিষয়ই অনুসরণের সর্বাধিক দাবীদার।' আর যারা বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতায় অনড় ছিল তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের নাম-ধাম ও দাবী-দাওয়ারও মৃত্যু হয়ে যায়। সব না হলেও আজ তাদের অধিকাংশ সম্পর্কে লোকজন কিছুই জানেনা। আর যা জানে, তা শায়খ মোহাম্মাদের চিঠি-পত্রের বদৌলতেই জানে।

পৃথিবীতে তাদের এই অবস্থা, আখেরাতে তো তাদের প্রতিফল আল্লাহপাকের হাতে। তিনিই তো সব গুপ্ত ও অন্তরস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াক্বেফহাল। মুফতি প্রধান মাননীয় শেয়খ আব্দুল আযীয বিন বায (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) শায়খ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের বিরোধীপক্ষকে তিন *শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; যথা:*

১। বিভিন্ন কুসংস্কারে আসক্ত উলামাবৃন্দ। এরা সত্যকে বাতেল এবং বাতেলকে সত্য হিসেবে দেখে। তারা বিশ্বাস করে যে, কবরের উপর সমাধি

ও মসজিদ তৈরী করা এবং আল্লাহকে ছেড়ে কবরবাসীদের ডাকা, তাদের সান্নিধ্য ও আশ্রয় কামনা করা ইত্যাদি ধর্ম ও হেদায়েতের কাজ। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, এ জাতীয় কাজ যারা অস্বীকার করে তারা প্রকৃত পক্ষে নেক লোক ও আওলিয়াগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব।

২। আরেকদল হলো, যারা ছিল ইল্‌মে দ্বীনের দাবীদার। তারা শায়খ মোহাম্মাদের দাওয়াতের প্রকৃত হকিকত সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। তিনি যে সত্যের প্রতি আহবান করছিলেন সেই সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে অবগত ছিলনা। বরং তারা অন্যদের অন্ধ অনুসরণকারী ছিল এবং কুসংস্কারপন্থী ও ভ্রান্ত লোকদের কথা সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, তারা নিজেরা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত; বিশেষ করে, নবী-আওলিয়াগণের প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুতা ও তাঁদের কেরামতসমূহ অস্বীকার সম্পর্কিত শায়খ মোহাম্মাদের প্রতি আরোপিত অপবাদগুলোর ক্ষেত্রে। ফলে, তারা শায়খ মোহাম্মাদের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠে এবং তাঁর দাওয়াতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতঃ ঘৃণা ভরে দূরে সরে থাকে।

৩। অন্য একদল হলো, যারা আপন আপন পদ ও মর্যাদা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত ছিল। সুতরাং তারা তাদের এই স্বার্থের খাতিরে শায়খ মোহাম্মদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠে, যাতে ইসলামী

দাওয়াতপন্থীদের হাতে তাদের পদমর্যাদার বিনাশ সাধিত না হয় এবং দেশের কর্তৃত্ব এরা দখল করে না নেয়। (১)

পরবর্তীতে এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের প্রথম সারির বিরোধীরা, যারা বিভিন্ন এলাকা ও দেশে দেশে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে শায়খ মোহাম্মদ যা বলেননি এমন অনেক কথা অপবাদ স্বরূপ ছড়িয়ে রেখেছিল, তাদের জন্য ধীরে ধীরে জমিন সংকোচিত হয়ে উঠে। যখন মানুষ তাঁর দাওয়াতের প্রকৃত হকীকত জানতে পেরে আল্লাহর খালেছ দ্বীন হিসেবে উহা গ্রহণ করে নেয়; যেহেতু এটিই হল আল্লাহর সত্যিকার খালেছ ধর্ম। তখন ঐসব বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে দেশত্যাগ ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর ছিলনা। তারা দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে এই অপকর্ম অব্যাহত রাখে এবং সেখানে প্রশস্ত ময়দান পেয়ে লম্ফঝম্ফ করে বিরাট সংখ্যক মুসলমানদের সম্মুখে এই দাওয়াতকে বিকৃতরূপে তুলে ধরে। এমনকি, অনেক আলেমও চিন্তা-ভাবনা না করে তাদের ধোকায় পড়ে যান। এই ধরণের বিশিষ্ট কয়েকজন আলেমের কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১। সুলায়মান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুহাইম :

শায়খ মোহাম্মদের বহু পত্রে এই ব্যক্তির উল্লেখ

---

(১) ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবঃ তাঁর দাওয়াত ও জীবন-চরিত, রচনায়ঃ শায়খ ইবনে বায, পৃষ্ঠা ২৭-২৮ দ্রষ্টব্য।

করে বলা হয়েছে যে, ইনি শায়খ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শহরে আক্রমণাত্মক চিঠি-পত্র প্রেরণ করেন। এর ফলে মানুষের কাছে এমন অনেক বিষয়ের ধারণা জন্ম নেয়, যে সম্পর্কে তিনি আদৌ কোন কথা বলেননি। এই সুলায়মান ইবনে সুহাইম এককালে রিয়াদের অন্যতম আলেম ছিলেন এবং সাউদী সরকারের হাতে রিয়াদের পতনের পর তিনি আল-আহসা, তারপর সেখান থেকে ইরাকের জুবায়র নামক স্থানে চলে যান। সেখানেই তিনি ১১৮১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে এখনও তার অনেক বংশধর জীবিত রয়েছেন। (১)

এই সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রতি সুহাইম পরিবারের আরো অনেক সদস্যের পক্ষ হতে শত্রুতামূলক ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের খবর পাওয়া যায়। এরা সবই ছিলেন মাজমা ও রিয়াদ এলাকার তৎকালীন আলেম-উলামাদের অন্তর্ভূক্ত। সম্ভবতঃ তাদের এহেন আচরণের পিছনে সক্রিয় ছিল আলেমগণের মধ্যকার পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও অভিমান। কারণ, মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থার আশ্রয় গ্রহণে শয়তান সদা-সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

২। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ফিরুজ নজদী:

ইনি মূলতঃ নজদবাসী ছিলেন, তবে তার জন্ম

----

(১) ইবনে বাস্সাম কর্তৃক রচিত 'গত ছয় শতাব্দীর নজদী উলামাবর্গ' ১মখণ্ড পৃষ্ঠা ৩২২ এবং তারিখে ইবনে গান্নাম।

আল-আহসায়। তিনি তৎকালীন স্বনামধন্য উলামাদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বছরার উছমানী গভর্ণর আব্দুল্লাহ আগা তার প্রতি বিশেষ সদয় হন। তারই সান্নিধ্যে তিনি পরবর্তীকালে বছরায় বসবাস করেন। হিঃ ১২১৬ সনে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং জুবাইর নামক এলাকায় তাকে দাফন করা হয়।

সাউদী বাহিনী কর্তৃক আল-আহসা দখলের প্রাক্কালে মুহাম্মদ ফিরুজ সেখান থেকে পলায়ন করে বছরায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারণ, প্রথম থেকেই তিনি এই আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাই, এই আন্দোলনকে স্তব্ধ ও নির্মূল করতে উছমানী সুলতানকে প্ররোচিত করার জন্য বছরার গভর্ণরের পক্ষ থেকে সহযোগিতা লাভ করেন।(১) এই ব্যাপারে তার অনেক শিষ্যও তাকে সমর্থন প্রদান করেন। তবে মুহাম্মদ ইবনে রশীদ আল-আফালিক্বী এদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে যান।

ইমাম সাউদ ইবনে আব্দুল আযীয যখন মদীনায় প্রবেশ করেন তখন তিনি উলামাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বীয় স্বভাবসুলভ উদারতায় ইবনে রশীদকে সম্মানিত করেন এবং মদীনার বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করেন। ফলে, ইবনে রশীদ সালাফী আন্দোলনকে সমর্থন করেন

----

(১) উপরোক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮৮২-৮৮৬ এবং তারিখে ইবনে গান্নাম ও তারিখে বিশ্‌র।

এবং এর একজন আহ্বায়ক হিসেবে সেখানে সুপরিচিত হয়ে উঠেন। শেষ বয়সে মিশরে অবস্থান শুরু করলে সেখানে তার সালাফী আন্দোলনের প্রচেষ্টা বহুলভাবে ফলপ্রসু হয়ে উঠে। লোকগণ তাকে ভালবাসতে শুরু করে এবং এর পিছনে সালাফী আন্দোলনের সঠিক পরিচয় সুষ্ঠভাবে উপস্থাপনে তার ভূমিকাই ছিল প্রধান। ১২৫৭ হিজরীতে তিনি কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। (১)

৩। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আফালিক্ব

আলেম হিসেবে তিনি আল-আহসায় একজন উচ্চমর্যাদার লোক ছিলেন। শিক্ষার্থীদের সমাগম হতো তাঁর বাসায়। ১১৬৩ হিঃ সনে আল-আহসায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি উহার বিরোধিতা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি শায়খ মোহাম্মদ (রহঃ) কে চ্যালেঞ্জ করে এক পত্রে কোরআন শরীফের সূরা আল আদিয়ায় উল্লেখিত মাজায, ইস্তে'আরা, কেনায়া ইত্যাদির মত অলংকার শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলোর স্পষ্ট বর্ণনা প্রদানের আহবান জানান। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, অলংকারশাস্ত্র ও পরিভাষাগত নিপূন বাক্যাবলীর উপস্থাপনই একমাত্র মাধ্যম যাদ্বারা আল্লাহকে জানা, তাঁর তাওহীদ সম্পর্কে অবগত

----

(১)'নাজদবাসী খ্যাতনামা উলামাবর্গ' রচনায়ঃ আব্দর রহমান আলে শায়খ, পৃষ্ঠা-২২৮ এবং নাম আহমাদ বলা হয়েছে।

হওয়া, তার এবাদতে নিষ্ঠাবান হওয়া ইত্যাদি, যা আল্লাহর প্রতি বান্দাহর উপর ওয়াজিব, সেগুলোর বাস্তবায়ন করা সম্ভব। শায়খ বাস্‌সাম তার জীবন-চরিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন।(১)

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে ঈসা আল-মুওয়াইসী :

তিনি হুরমা অঞ্চলের কাজী ছিলেন। শায়খ মোহাম্মদের পত্রাবলীতে বহুবার তার উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ মোহাম্মদ তার কার্যকলাপ উল্লেখ করে লোকদের সতর্ক করে দিতেন। আরব উপদ্বীপে সালাফী আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পূর্বেই হিঃ ১১৭৫ সনে আব্দুল্লাহ আল-মুওয়াইসী আপন শহর হুরমায় মৃত্যুবরণ করেন। (২)

৫। উছমান ইবনে আব্দুল আযীয মনছুর :

ইনি ইরাকে পড়াশুনা করেন। তার উস্তাদগণের মধ্যে দাউদ ইবনে জার্জিস ও মুহাম্মদ ইবনে সাল্লুম আল-ফারাজী অন্যতম। এরা উভয়ই সালাফী আন্দোলনের কট্টর বিরোধী ছিলেন। ইবনে জার্জিস ও নাজদের উলামাগণ আন্দোলন সম্পর্কে উভয়ের প্রতিক্রিয়া ও তাদের ঘৃণ্য মতামত জনগণের সম্মুখে ব্যাপকভাবে ব্যক্ত করেন। ইবনে বাস্‌সাম তার

---

(১) ইবনে বাস্‌সাম কর্তৃক রচিত 'গত ছয় শতাব্দীর নাজদী উলামাবর্গ' ৩মখণ্ড পৃষ্ঠা ৮২০।

(২) উপরোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৬০৪।

জীবন-চরিতে বলেন: এই লোকটি তার আক্বীদাহগত দিক দিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। একবার সালাফী আন্দো-লনের পক্ষে, আবার তাথেকে দূরে গিয়ে উহার শত্রুদের কাতারে মিলিত হতেন। তাইতো, দাউদ ইবনে জর্জিস, যিনি মৃত নেক লোকদের ওসীলা গ্রহণ ও তাদের কাছে সাহায্য কামনা বৈধ বলে বিশ্বাস করতেন, যখন নজদ এলাকায় উপস্থিত হন তখন উছমান তার সহযোগিতায় এগিয়ে যান, তার ও তার মতবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন, তার লিখিত পুস্তকের উপর মন্তব্য লিখেন এবং তার জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে ছয়ত্রিশটি গুচ্ছ সম্বলিত প্রশংসা-সূচক একটি কবিতা রচনা করেন। এর প্রত্যুত্তরে নজদবাসী সাতজন আলেম একই ছন্দ ও ক্বাফিয়ার দ্বারা রচিত অনেকগুলো কবিতা লিখে তার কাছে প্রেরণ করেন। (১)

৬। *মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ* :

মোহাম্মদ ইবনে হুমাইদ হিঃ ১২৩২ সনে ক্বাছীম অঞ্চলের উনাইজা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মক্কা শরীফে হাম্বলী মাজহাবের মুফ্তী ছিলেন এবং ১২৯৫ হিজরীতে তায়েফ শহরে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে বাস্সাম তার জীবন-চরিতে বলেন:

'মোহাম্মদ ইবনে হুমাইদ -মক্কার হরম শরীফে

---

(১) উপরোক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৯৬।

হাম্বলী মাজ্হাবের মুফ্তী- প্রথমতঃ তার পদবীর সুবাদে সালাফী আক্বীদাহর ঘোর বিরোধী উছমানী খেলাফতেরই আনুগত্য করেন; দ্বিতীয়তঃ সালাফী দাওয়াতের উপর আপতিত বিপর্যয়ের ফলে আন্দোলন স্তব্দ হওয়ার পর দেশের অভ্যন্তরে তার উপস্থিতি ও আন্দোলনের শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীদের সহযোগীদের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তৃতীয়তঃ নজদ এলাকার বাইরে ঐসব উলামাদের হাতে তার শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ যারা এই সালাফী আন্দোলন বিরোধী সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করে রেখেছিল; এইসব কারনে মোহাম্মদ ইবনে হুমাইদের প্রকৃতিগত চরিত্র এমন ভাবে গড়ে উঠে যে, শেষপর্যন্ত তিনি সালাফী আন্দোলনের একজন কট্টর বিরুধী ও উহার শত্রুপক্ষের একজন বিশেষ সহযোগী হয়ে যান।'(১)

(৭) মারবাদ ইবনে আহমাদ তামীমী ঃ

প্রথম থেকেই মারবাদ তামীমী সালাফী আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং হিঃ ১১৭০ সনে ইয়ামন দেশে চলে যান। সেখানে বসে তিনি উক্ত আন্দোলনের আহ্বানকারী ও উহার ধারক-বাহক গণের সুনাম ক্ষুন্ন করা ও তাদের সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ ছড়ানোর কাজে লিপ্ত থাকেন। প্রায় ১০মাস সেখানে থাকার পর বন্ধু-বান্ধবদের পরিত্যাগ করে হেজাযের দিকে চলে আসেন।

----

(১) উপরোক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮৬৫-৮৬৬ এবং দেখুন: ইবনে হুমাইদ কর্তৃক রচিত' আস সুহুবুল ওয়াবিলা আলা জারায়ীল হানাবিলা'।

ইবনে বাস্সাম এইলোকের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: বলার উদ্দ্যেশ্য হলো, এই ব্যক্তি এবং তার মত আরো যারা সংস্কারমূলক সালাফী আন্দোলনের বিরোধিতা করছিলেন। এরাই প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের সুনাম বিনষ্ট করেছেন এবং নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে উহার বিরুদ্ধে ভুল প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে গেছেন। ফলে, যে সব লোকের এই আন্দোলনের হক্বীকত জানা ছিলনা বা যাদের কাছে এর সঠিক তথ্যাদি পৌঁছেনি, তারা এদের প্ররোচনায় এই আন্দালন সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। তাই, এই আন্দোলনের পক্ষে একক ভাবে সম্মিলিত শত্রুদের মোকাবেলা করতে হচ্ছিল; যাদের মধ্যে ছিল হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী অথবা প্রতারিত ব্যক্তিবর্গ অথবা ধর্ম ও সংস্কারবিরুধী মহল।

এরপর আসে আন্দোলনের মূল ঘাঁটির উপর উছমানী বাহিনীর আক্রমণ। এই আক্রমণ আন্দোলনের গতি বন্ধ করে দেয় এবং আন্দোলন কারী, এর ধারক-বাহক সাউদী প্রথম সম্রাজ্যের শাসকবৃন্ধ ও শায়খ মোহাম্মদের সুযোগ্য আলেম সন্তান-সন্ততিদের নির্মূল করার ফলে উহার কার্যক্রম ও তৎপরতা স্তব্দ হয়ে যায়। অবশেষে, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে পুনরায় এই সালাফী আন্দোলন জেগে উঠে। আল্লাহপাক দুর্ধর্ষ বীর নেতা ইমাম তুরকী ইবনে আব্দুল্লাহর আবির্ভাব ঘটালেন, যিনি বীরবিক্রমে তুর্কী বাহিনীর মোকাবেলা করেন এবং দেশকে এদের হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত ও পবিত্র

করেন।(১) আল-হামদু লিল্লাহ, এখন পর্যন্ত সেই দেশ সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে এবং মহান শরীয়তে ইসলামীর ছত্র-ছায়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করছে।

শায়খ বাস্‌সাম শেষ পর্যায়ে বলেন: এই মারবাদ তামীমী অতঃপর হেজায থেকে নিজ শহর হুরাইমালায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সাউদ কর্তৃক হুরাইমিলা দখলের পর সেখান থেকে তিনি পালিয়ে রাগদাহ নামক শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন সেখানকার আমীর আলী আল-জুরাইসী তাকে ধরে হত্যা করে ফেলেন। এই ঘটনা ঘটে হিঃ ১১৭১ সনে। (২)

(৮) তৎকালে দেশে আরো অনেক আলেম ছিলেন, কিন্তু সালাফী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে যে যে শহরে তারা অবস্থান করছিলেন সেখানকার আন্দোলনবিরোধী লোকদের প্রতি তাদের সহানুভুতি পরিলক্ষিত হয়; যেমন:

–মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে সাল্লুম আল-ফারাজী:

ইনি সুদাইর অঞ্চল(রিয়াদ ও ক্বাছীমের মধ্যবর্তী একটি এলাকার নাম)থেকে ইরাকের জুবায়র নামক

---

(১)দেখুন, ইবনে বাস্‌সাম কর্তৃক রচিত 'গত ছয় শতাব্দীর নাজদী উলামাবর্গ' ৩য়খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪৯।

(২) উপরোক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫০

স্থানে আপন শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ফিরুজের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে চলে যান। ইরাকে তিনি ও তার দুই পুত্র আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল লতীফ মৃত্যবরণ করেন। তার এই পুত্রদ্বয় তখনকার দিনে বাছরার বিশিষ্ট আলেমদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

–ইব্রাহীম ইবনে ইউসুফ ঃ

ইনি দামেস্কে শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। সেখানকার উমাভী জামে মসজিদে তার রীতিমত দরসের হলক্বা (পাঠচক্র) বসতো। হিঃ ১১৮৭ সনে রহস্যজনক ভাবে সেখানে তিনি নিহত হন।

–রাশিদ ইবনে খুনাইন ঃ

ইনি রিয়াদের নিকটবর্তী আল-খার্‌জ থেকে আল-আহসা শহরে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। (১)

এতদ্ব্যতীত আরো অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যাদের নাম শায়খ মোহাম্মদের পত্রাবলীতে উল্লেখ রয়েছে; যেমন-ইবনে ইসমাঈল, ইবনে রাবী'আ, ইবনে

----

(১) এদের জীবন-চরিত জানার জন্য দেখুন, ইবনে হুমায়দের-'আস-সুহুবুল ওয়াবিলা আলা জারা ইহিল হানাবিলা', ইবনে বাস্‌সাম কর্তৃক রচিত 'গত ছয় শতাব্দীর নাজদী উলামাবর্গ' এবং মোহাম্মদ ইবনে উছমানের-'রাওজাতুন নাজিরীন আন মাআছিরি উলামা ই নাজদ ওয়া হাওয়াদিছিস সিনীন'

মাতলাক্ব, ইবনে আব্দুল লতীফ, ছালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ও অন্যান্যরা। অন্দোলন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন অপবাদের প্রত্যুত্তরে শায়খ মোহাম্মাদের লিখিত পত্রাবলীর সংখ্যা দাড়ায় প্রায় একান্নতমের কোঠায়। এগুলো ৩২৩ পৃষ্ঠার একটি খণ্ডে ছাপা হয়েছে। শায়খ মোহাম্মাদ ও তাঁর দাওয়াতের হক্বীকত সম্পর্কে জানার আগ্রহীদের জন্য সংকলনটি অত্যন্ত উপকারী।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা শায়খ মোহাম্মাদের বিরোধী ছিল তাদের অনেকের কাছে সত্য ও হক্বীকত প্রকাশিত হওয়ার পর তারা স্বীয় পূর্ব অভিমত ত্যাগ করে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। কেননা, "সত্যই অনুসরণের সর্বাধিক দাবীদার।"

নামকরণের উদ্দেশ্য

জনাব মাসউদ নাদাভী (রহঃ) তার "অপবাদের বেড়াজালে মজলুম সংস্কারক মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব" নামক গ্রন্থে যদিও বলেছেন :

'শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের প্রতি আরোপিত সর্বাধিক স্পষ্ট অপবাদ হলো, উহাকে ওহ্হাবী মতবাদ নামে আখ্যায়িত করা। স্বার্থান্বেষী মহল এই নামের মাধ্যমে সর্বদা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, এটা একটি ধর্মবহির্ভূত আন্দোলন। এ ব্যাপারে ইংরেজ, তুর্কী এবং মিশরীয়রা একমত। তারা এই আন্দোলনকে এক ভীতিপ্রদ প্রেত হিসেবে এমনভাবে ধরে নিয়েছিল যে, বিগত দুই যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বের যে কোন স্থানে যখনই কোন ইসলামী আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ইউরোপীয়গণ দেখেছে যে, এটা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী, তখনই তারা এর উপর নজদী ওহ্হাবী আন্দোলনের লেবেল এঁটে দিয়েছে, যদিও এই আন্দোলনসমূহে এই সংস্কার মূলক আন্দোলনের বিপরীত কিছু থেকে থাকে।(১)

তবে দেখা যায়, কাতারস্থ সর্বোচ্চ শরীয়তী কোর্টের বিচারক শায়খ আহমাদ ইবনে হাজার

----

(১) 'মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব- একজন মজলুম নির্দোষ সংস্কারক' অনূদিতঃ আব্দুল আলীম বস্তাওয়ী, প্রতিপাদনেঃডঃ মোহাম্মদ তক্বীউদ্দীন হিলালী, পৃষ্ঠা-১৬৫

পূর্ববর্তী কয়েকজন হাম্বলী তর্কবাগিশদের উপর আরোপিত বহু অপবাদ শায়খ মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের উপর আরোপিত অপবাদ সমূহের সাথে সামঞ্জস্য প্রমাণিত করেছেন। কারণ, বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা কেবল অপবাদের মাধ্যমেই অন্যপক্ষের মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করে। এইভাবে ইসলামী আন্দোলনগুলোকে ধ্বংস ও স্তব্ধ করার ক্ষেত্রে সম্রাজ্যবাদীরা ঐ একই পন্থা অবলম্বন করে যাচ্ছে।

শায়খ আহমদ বিন হাজার "হাম্বলী সালাফী অপবাদকারীদের বক্তব্য খণ্ডন" নামক তার গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন তার কিয়দাংশ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

"তারা শায়খ মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে বলে যে, তারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন মর্যাদা রাখেনি। তাদের একজনতো বলেই ফেললো যে, আমার হাতের লাঠি রাসূলের চেয়েও উত্তম। তাদের কাছে উলামা ও নেকলোকদের কোন স্থান নেই। তারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শাফা'আত মানে না, তারা অন্যান্য সব মুমিনদের কবর যিয়ারতকে হারাম মনে করে, তারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ পড়া মানে না, পূর্ববর্তী নেক ইমামবর্গের লিখিত বই-পুস্তকের কোন গুরুত্ব দেয় না, বরং এগুলোকে তারা জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ইমামবর্গের তাক্বলীদ করাকে তারা জায়েজ মনে করে না।

তাদের আক্বীদায় বিশ্বাসীদের বাদ দিয়ে যুগ যুগ ধরে অতীত মুসলমানদের তারা কাফের মনে করে। মীলাদুন্নবী উপলক্ষে পাঠ্যানুষ্ঠান(১) তারা হারাম বলে” ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

এর উত্তরে বলতে হয় যে, উপরোক্ত সবগুলো অপবাদই মিথ্যা। এতে সত্যের কোন লেশ নেই। শায়খ মোহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের গ্রন্থাবলী সর্বত্র ছাপা হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ বিতরণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত মিথ্যা অপবাদগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে যে কেউ সেসব বইগুলো পড়ে নিতে পারে। (২)

এথেকেই আমরা ওহ্হাবী নামের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান এবং ওহ্হাবী আন্দোলনকে পঞ্চম মাজ্হাব নামে ব্যাপক প্রচারের পিছনে যে মূল রহস্য রয়েছে তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। কেননা, মরক্কোর আলেমগণ সেই খারেজী আবাজী রুস্তুমী ওহ্হাবী মতবাদের অভিশাপ পূর্বেই ভুগেছে, যে মতবাদ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে আব্দুল ওহ্হাব বিন আব্দুর রহমান বিন রুস্তুম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

----

(১)জানা কথা, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিলাদ অনুষ্ঠান ও মিলাদপাঠ এবং এই উপলক্ষে এবাদত ও সান্নিধ্য লাভের জন্য যা করা হয় সবই বেদ'আত। দেখুন, শায়খ ইসমাঈল আনছারী রচিত- 'আল ক্বাওলুল ফাছল ফী মাওলিদে খায়রির রুসুল'।

(২)দেখুন তাঁর উক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা-৫৭ ও ৫৮ থেকে ১০১ পর্যন্ত।

এই সম্পর্কে তাদের কাছে ফাত্ওয়া রয়েছে এবং তারা এই মতবাদপন্থীদের সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত। যেমন, ইতিপূর্বে এর আলোচনা করা হয়েছে।

এই নামকরণ ও অপবাদ ছিল একটা পূর্বতৈরি (রেডীমেইড) পোষাকের মতই। ইসলামী আন্দোলনের শত্রুরা জনগণের মধ্যে ঘৃণা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে সরাসরি এই নব্য সংস্কারবাদী আন্দোলনের গায়ে উহা পরিয়ে দেয়। কেননা, এ কথা জানা আছে, মুসলিম বিশ্বে কেবল বেদা'আত ও কুসংস্কারপন্থীরাই সম্রাজ্যবাদীদের খেদমত সুষ্টভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

অপরদিকে, স্বার্থপর উলামাগণ প্রচারিত এই অপবাদ সমূহ ধরে রাখে এবং আন্দোলনের উপর বিভিন্ন প্রকার সংশয়-সন্দেহের ছাপ লাগিয়ে দেয়। অথচ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই ভিত্তিহীন অপবাদ সমূহের অবসান করা যেতো এবং তারা জানতে পারতো যে এগুলোর পিছনে কোন সত্যতা নেই। এর কারণ একমাত্র এটাই যে, তাদের হীন প্রবৃত্তি তাদেরকে এই ব্যাপারে অন্ধ ও নির্বাক করে রেখেছিল।

আন্দোলন সম্পর্কে যে সমস্ত সংশয়-সন্দেহের বেড়াজাল সৃষ্টি করা হয়েছিল সেগুলো প্রমাণিত করার জন্য আন্দোলনের শত্রুরা শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব ও তার ভাই সুলায়মান ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের মধ্যকার প্রথম দিকের বিরোধকে

সুযোগমত কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। নজদ এলাকার ও উহার বাইরের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত শায়খ সুলায়মানও প্রথম প্রথম এই দাওয়াত মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। যখন তাদের কাছে আন্দোলনের হক্বীকত সঠিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন তারা সত্যের দিকে স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে ফিরে আসেন এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রসার ও বাস্ত বায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এইভাবে শায়খ সুলায়মানও আরো অনেকের মত সত্যের পথে সন্তুষ্টচিত্তে আপন ভাইয়ের মতবাদ গ্রহণ করে সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং পরবর্তীতে সহোদর ভাইয়ের অন্যতম সহযোগী হিসেবে দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আমরা বলি, শত্রপক্ষ উভয় ভাইয়ের প্রাথমিক বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে এবং দুটি পত্র রচনা করে শায়খ সুলায়মানের নামে প্রচার করে। পত্র দুটির নাম ছিলঃ

১। 'আছ ছাওয়া'ইকুল এলাহিয়্যাহ ফির রাদ্ধি 'আলাল ওহ্হাবিয়াহ'

২। 'ফাছলুল খেতাব ফির রাদ্ধি 'আলা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব'।

এদিকে পর্যালোচনাকারীদের মতে পত্র দুটি শায়খ সুলায়মানের লিখা ছিলনা। বরং শত্রুরা জনগণের মধ্যে ঘৃণার মাত্রা বাড়ানোর জন্য এ দুটি তার নামে

আরোপ করে জনগণকে বুঝাতে চেয়েছিল যে, শায়খ মোহাম্মদের আপন ভাই, যিনি তার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি, তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেননি। প্রকৃত ঘটনা হলো, শায়খ সুলায়মান পরবর্তীতে তার ভাইয়ের অনুসরণকারী হয়ে যান এবং প্রথমদিকে বিরোধিতার করার জন্য ওজর পেশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে দার'ইয়া গমন করেন। (১)

উপরোক্ত পত্রগুলোর অসারতা ও শায়খ সুলায় মানের প্রতি সেগুলো আরোপের মিথ্যা প্রমাণে আরেকটি দলীল হলোঃ ওহ্হাবিয়া নামের চক্রান্ত কেবল তখনই প্রকাশ পায় যখন ইবরাহীম পাশার নেতৃত্বে নজদের উপর তুর্কী-মিশরীয় যৌথ আক্রমণ চালানো হয়। তাও শায়খ মোহাম্মদের মৃত্যুর বিশ বছরেরও অধিক পরে এবং শায়খ সুলায়মানেরও মৃত্যুর পর।

এর প্রমাণ 'নীপুর' নামক শায়খ মোহাম্মাদের সমসাময়িক এক ইউরোপীয় গ্রন্থকার তার গ্রন্থে ওহ্হাবী নামটি একটিবারও উল্লেখ করেননি। শায়খ মাসউদ নাদভী তার সম্পর্কে বলেন ঃ "এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'ওহ্হাবিয়া' এই শাব্দিক পরিভাষা সেই সময় পর্যন্ত লোকের মধ্যে পরিচিত

---

(১) আরো জানার জন্য 'মাজাল্লাতুল বুহুছিল ইসলামিয়া' ১৪২১ সনের ৬০তম সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধঃ 'সুলায়মান ইবনে আব্দুল ওহ্হাব, একজন নির্দোষ অভিযুক্ত আলেম' দ্রষ্টব্য।

ছিল না।তবে অনেকেই শায়খ মোহাম্মাদের দাওয়াতী আন্দোলনকে "নবধর্ম" নামে আখ্যায়িত করতেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তার এই মতবাদকে মুহাম্মাদী মাজ্হাব নামে পরিচয় দেওয়া হতো। এই পরিভাষা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় পার্ক হার্থের মুখে। যিনি হিঃ ১২২৯ সনে মুহাম্মাদ আলীর অভিযানের পর হিজায আগমন করেছিলেন। ঐতিহাসিক জাবারতির গ্রন্থেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।" (১)

আমাদের পূর্ববর্ণিত সদলারের ভ্রমণকাহিনীতেও এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ যদি সুলায়মান ইবনে আব্দুল ওহ্হাব তাদের অন্তর্ভুক্ত হতেন যারা তাঁর ভাই শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের পাল্টা জবাব দিচ্ছিলেন এবং দাওয়াতের বিরোধিতা করছিলেন তাহলে তার নাম বারবার উল্লেখ করা স্বাভাবিক ছিল এবং ঐসব ব্যক্তিদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হতো যারা কিছুদিন হলেও দাওয়াতের বিরোধিতা করছিলেন যখন আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তা একটা লেবাস ছিল যা তার গায়ে পরানো হয়। অথচ উহা তার জন্য শোভা পায়নি। যেভাবে উক্ত দাওয়াতী আন্দোলনের উপর এই বিশেষ পরিভাষা আরোপ করা হলো যার সাথে উহার কোন সম্পর্কই ছিলনা। কারণ, শায়খ

----

(১) দ্রষ্টব্যঃ জনাব মাসউদ নাদাভী রচিত- 'মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব' পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৮।

মোহাম্মাদের দাওয়াতী আন্দোলন এবং রুস্তুমী খারেজী ওহ্হাবী মতবাদের মধ্যে বিষয় ও বিশ্বাসগত, স্থান ও সময় এবং শরীয়তী দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের দিক দিয়ে ঢের পার্থক্য বিরাজ করছিল। সুতরাং যখন এর মধ্যে শায়খ সুলায়মানের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়নি তখন বলতে হয় যে, তার প্রতি উক্ত কিতাবদ্বয়ের সম্বন্ধ করা ঠিক হয়নি।

রুস্তুমী ওহ্হাবী মতবাদ আহলে সুন্নাত ও জামাতের আক্বীদাহর পরিপন্থী ছিল। যারা তাদের নীতিমালা ও অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছে তাদের কাছে তা ভাল ভাবেই পরিচিত। পক্ষান্তরে, শায়খ মোহাম্মদ হলেন ইসলামের সঠিক অনুসারী, তিনি নতুন কোন শরীয়ত প্রবর্তনকারী নন। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের মাজহাব অনুসারে চলেছেন। তার নিজস্ব লিখিত পত্র ও গ্রন্থাবলী, তার ছেলে ও ছাত্রগণের লিখা বই-পুস্তক এর জলন্ত প্রমাণ। তিনি আপন মতামতকে কোরান ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত সঠিক দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিপাদন করতেন। তিনি সেই পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করে চলেছেন যে পন্থায় ইসলামের স্বর্ণযুগে অগ্রবর্তী আল্লাহর নেক বান্দাহগণ জীবন-যাপন করে গেছেন। একথা তার আচার ব্যবহার ও চারিত্রিক গুণাবলীতে দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর হয়ে আছে।

চতুর্থ প্রমাণ ঃ শায়খ সুলায়মান ইবনে আব্দুল ওহ্হাব কর্তৃক তার ভাই শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের বিরোধীতা আন্দোলনের প্রথম

দিকেই ছিল। এই বিরোধিতা মৌখিক কথাবার্ত ও ছোটখাট চিঠিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে গান্নাম, যিনি আন্দোলনের বিস্ত ারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, শায়খ মোহাম্মদ ও তাঁর ভাই সুলায়মানের সমসাময়িক ছিলেন। তাদের উভয়ের মৃত্যুর কিছুকাল পর তার মৃত্যু হয়। অথচ তিনি শায়খ মোহাম্মাদের বিরোধীদের বর্ণনাকালে এ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি।

এ হলো একদিক। অন্যদিকে, ওহ্হাবী শব্দটি শায়খ মোহাম্মাদ ও শায়খ সুলায়মান উভয় ভাইয়ের পিতা আব্দুল ওহ্হাবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। একা শায়খ সুলায়মানের প্রতি উহা আরোপ করা সম্ভব নয়। কেননা, একদিকে যেমন এর দ্বারা তাঁর পিতাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, অপরদিকে ঠিক তেমনি, তিনিতো জানতেন যে এই সম্বন্ধপ্রক্রিয়া ভুল, কেননা, মূল বিষয়ের প্রতি তা আরোপিত হয়নি। মক্কীকে মাদানী আর মাগরিবীকে হিন্দি বলাতো ঠিক হবেনা। উপমা স্বরূপ বললেওতো তারা উভয়ই (প্রত্যাখ্যানকারী ও প্রত্যাখ্যাত) এতে শরীক থাকেন। সুতরাং উপরোক্ত পুস্তকদ্বয়ের প্রকৃত লিখক হলেও একথা সুলায়মান ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের উপর আরোপ করা সঙ্গত হবেনা।

পঞ্চম প্রমাণ ঃ সংস্কারমূলক আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালীন লিখকগণের ভাষ্য। এই দাওয়াত পশ্চিমা সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাহরণ স্বরূপ এই দাওয়াতের সমসাময়িক গ্রন্থকার

'নিপুর'-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি একসময়ে আল-আহ্সা শহরে উপস্থিত হন। তিনি এই আন্দোলনকে শায়খ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের সাথে সম্বন্ধ করে মোহাম্মদী নামে আখ্যায়িত করেন। আবার কখনও উহাকে নব্য দাওয়াত নামে অভিহিত করেন। সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করার জন্য এই নামদুটি যথেষ্ট ছিল না। অপরদিকে হোলবর্ক হিঃ ১২২৯ সনে হিজাজ পৌঁছেন এবং মোহাম্মদ আলীর সাথে সাক্ষাৎ করে এই দাওয়াতের বিশ্বাসগত মর্যাদা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত দেখে উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনা মতে দেখা যায়, তিনি এই আন্দোলনের বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা করেন।

এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ধরণের নাম গ্রহণের পিছনে রহস্যময় কলা-কৌশল নিহিত ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এর দ্বারা জনমনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা, দাওয়াতের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়ার বৈধতা অর্জন করা এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পন্থায় এধরণের নামধারী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর অজুহাত বের করা, যে নামের ঐতিহাসিক পটভূমি মানুষের অনুভূতিতে সাড়া যোগায় ও আবেগ উদ্রেক করে।

এজন্য এই নাম আরোপের পূর্বে ট্যাক্স ও অর্থ ব্যয় করার আহ্বানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সম্পর্কে জাবারতী তার ইতিহাসে তাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তারা

বলেছে, খাওয়রিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যেহেতু ওহ্হাবিয়া, আবাজিয়াহ ও খারিজিয়াহ মতবাদের পুনর্জন্ম ঘটেছে; সুতরাং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সকলের উপর যথাসাধ্য জান-মাল ব্যয় করা ওয়াজিব।

এহলো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ,যার জন্য ইতিহাসের পাতায় খচিত এই উপাধির রহস্যের মুখোশ উন্মোচনে উদ্যত হলাম। শায়খ সুলায়মানের মৃত্যুর কিছুদিন পর তার প্রতি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সম্বন্ধ আরোপ করা মিথ্যা বৈই কিছু নয়। এভাবে সাম্প্রতিককালে হামফারের স্মৃতি কথা সত্যের বিকৃতি সাধনে তৎপর হয়েছে। তার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে একজন ব্রিটিশ গুপ্তচর ছিল। আরো বলা হয়েছে যে, শায়খ মোহাম্মদের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এসব কথার কোন আসল খুজে পাওয়া যায়নি এবং এর পূর্বে কখনও তার নামও শুনা যায়নি। এ সমস্ত দাবীর পিছনে কোন দলীল-প্রমাণের সমর্থন নেই। মিথ্যার তো কোন সীমা নেই।

ইসলামের শত্রুগণ এজাতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কারণ, এতে রয়েছে চিন্তার বিশৃঙ্খলা, ফেতনা সৃষ্টি এবং নিষ্ঠাবান যে কোন ধর্মপ্রচারকের উপর থেকে বিশ্বাস হারানোর যাবতীয় উপকরণ।

বিভিন্ন দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি ও নানা অপবাদ রটানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের উপর আজকের প্রচার মাধ্যমসমূহ এক অকাট্য প্রমাণ। কেননা, এসব দেশের সমাজ পদ্ধতি অন্যান্য দেশ থেকে ব্যতিক্রমপন্থী। এর কারণ, নিষ্কলঙ্ক পরিচ্ছন্ন দ্বীন যখনই প্রকাশ পায় এবং পুতঃপবিত্র ধর্ম ইসলামের মধ্যে মানুষ পাপিষ্ঠ বিষয়াদি থেকে আত্মা ও সমাজের মুক্তির জন্য এর প্রতি মানুষের ঝোঁক বৃদ্ধি পায় তখনই ইসলামের শত্রুরা এই আন্তরিক ঐক্যসৃষ্টিকারী কজের ফলে বিচলিত হয়ে উঠে এবং তাদের সহযোগী ও সহচরদেরকে এই ঐক্য ও সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। এর একটা উদাহরণ দেখতে পাবেন মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে। যখন ফিলিস্তিনিরা পাথর ও শ্লোগানের মাধ্যমে অভ্যুত্থান শুরু করে, তখন ইহুদীরা ফিলিস্তিনি শিশুগণ কর্তৃক জিহাদের আহ্বান ও আল্লাহু আকবর ধ্বনি শুনে বিচলিত হয়ে উঠে এবং তাদের প্রচার মাধ্যম দ্বারা সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় যে, এই বিদ্রোহ কমিউনিজমের বিদ্রোহ, যাতে তাদের কাছে ভীতিপ্রদ ইসলামী দিগদর্শন থেকে দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। ‘অতীতের সাথে বর্তমানের কি আশ্চর্য্য মিল।’

দেশে দেশে এবং যুগে যুগে এর উদাহরণ অনেক রয়েছে। ১২৬১ হিজরীতে মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণকারী আল ওয়াতারীর কথা ধরুন। উস্তাদ আহমাদ আল-’আম্মারী, যিনি “মরক্কোর কাঠগড়ায় সালাফী ওহ্হাবী আন্দোলন” শিরোনামে তার

প্রবন্ধের প্রতিপাদন করেছেন। প্রবন্ধের উপর প্রশ্নোত্তরকালে তিনি বলেন ঃ আল-ওয়াতারী কি এই বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মরক্কোর সালাফী ওহ্হাবী মতবাদের পর্যালোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করেননি যে তিনি প্রাপ্ত সংকেত ও ইশারার মাধ্যমে পর্যালোচনা করেছেন প্রাচ্যের সালাফী আন্দোলনকে? তিনি মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের বিরুদ্ধে কেন তুর্কী সুলতান ও মিশরের গভর্ণরের পক্ষপাতী হলেন? না এর পিছনে অন্য কোন বিষয় নিহিত রয়েছে? এটা কি সালাফী মতবাদের বিপক্ষে সুফী মতবাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার? যেসব কারণে আল-ওয়াতারী তার প্রবন্ধ রচনা করেন সেগুলো উপস্থাপনের সময় উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করবো। (১)

সুতরাং দেখা যায়, যে কেউ যা লিখে তার পিছনে কোন কারণ ও উদ্দেশ্য নিহিত থাকে।

একথা সত্য যে, আল-ওয়াতারীর পর্যায়ের অনেক লোকের উপর ১২২৫ হিজরীতে ইমাম মোহাম্মদ বিন সাউদের পত্র পৌঁছার পর সালাফী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মাওলা সুলায়মান আল-আলাভী সুসাহিত্যিক সৈয়দ হামদুন ইবনে হাজ্জ আল-ফাসীর প্রতি এই পত্রের উত্তর প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। উত্তরের সাথে তিনি

---

(১) দ্রষ্টব্য 'মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব' বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৫ সন।

ইবনে সাউদের প্রশংসা করে একটি কবিতা সংশ্লিষ্ট করে পাঠান। আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আল-কানসুস তাকিদ করে বলেন যে, হামদুন বিন হাজ্জ সুলতান সুলায়মানের নির্দেশেই ইবনে সাউদের উত্তর দেন এবং তার প্রশংসা করেন। এর প্রমাণে তিনি সন্তোষজনক দলীলাদিও পেশ করেন। এরপর প্রতিপাদনকারী ইমাম সাউদের প্রশংসায় লিখিত মিমিয়া কবিতার কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করেন।

বিবাদ-বিতর্কের ফলাফল

যে শহরের সাথে শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের নাম জড়িত এবং যেখান থেকে তাঁর দাওয়াতের প্রথম যাত্রা শুরু, সেই 'আল উয়াইনা' শহরটি তখন জ্ঞান-শিক্ষার একটি মহৎ দুর্গে পরিণত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থী ও জ্ঞানপিপাসুরা এখানে এসে ভিড় জমাত। এর পার্শ্বেই ছিল 'আল- জুবাইলা' নামে ছোট্ট একটি শহর। বর্তমানে উভয়টি মিলে একটি শহরে পরিণত হয়ে গেছে। শহরদুটি সাউদী আরবের রাজধাণী 'রিয়াদ' থেকে প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

এই 'আলজুবাইলা' শহরেই রাসূল (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর অনেক ছাহাবীর সমাধি বিদ্যমান রয়েছে, যারা হজরত আবু বকর (রাজিয়ালাহু আনহু) এর খেলাফতকালে প্রসিদ্ধ রিদ্দা যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। এই শহরের

সেই ঐতিহাসিক ইমামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে বিদ্রোহী কুখ্যাত মুসাইলামাতুল কাজ্জাব (মিথ্যুক মুসাইলামা)এর হত্যার মাধ্যমে আলাহপাক তার দ্বীনকে জয়ী ও শক্তিধর করেছিলেন।

অজ্ঞতা, ধর্মীয় বিশ্বাসে আন্তরিক দুর্বলতা ও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে লোকজন হজরত যায়দ ইবনে খাত্তাব ও অন্যান্য ছাহাবীগণের কবরের উপর সমাধি তৈরী করে এর উপর বিভিন্ন ধরনের গম্বুজ বানিয়ে রাখে। এরপর শুরু হয় তাদের নামে মানত পেশ করা, তাদের কবরের পার্শ্বে কুরবাণী জবাই করা এবং আলাহ পাককে ছেড়ে এসকল কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে আবেদন পেশ করার জঘন্য শির্কী প্রথা।

অনেকের মতে মুসলিম বিশ্বে কবরের উপর সমাধি তৈরীর প্রচলন আরব উপদ্বীপে 'কারামিতা' এবং মরক্কো এবং পরবর্তীতে মিশরে ফাতিমী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সাথে বিশেষ ভাবে জড়িত। কিন্তু উলামাগণ এই ব্যাপারে প্রায় নীরব ভূমিকা পালন করেন। এর কারণ, মূল আক্বীদাহর দুর্বলতা, যা মুমিনের পক্ষে চালিকা-শক্তির কাজ করে। এমন কি, এই দুর্বলতা এমন স্তরে পৌছে যায় যে, কোন এলাকায় সমাধি তৈরীর জন্য কোন ওলীর কবর না পাওয়া গেলে সেখানকার লোক বরকত হাছেলের জন্য গাছ-বৃক্ষ, পাথর-গুহা ইত্যাদির অন্বেষন করতো।

কোন বিজ্ঞ আলেমের পক্ষে সঠিক ও নির্ভেজাল আক্বীদাহ থেকে মানুষের এইভাবে দূরে চলে যাওয়া এবং বিকৃত আক্বীদায় লিপ্ত হওয়ার মধ্যে উম্মতের যে ক্ষতি ও বিনাশ রয়েছে তা অনুধাবন করা সত্বেও বিষয়টি বলার এবং সঠিক অবস্থা সরকার কর্তৃক সহযোগিতাপ্রাপ্ত জনগণের ভয়ে তাদের সম্মুখে তা তুলে ধরার মত তার সাহসের অভাব ছিল। কিন্তু শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব তা তখনই অনুভব করতে পেরেছেন যখন তিনি ছাত্র ছিলেন। এজন্য তিনি নিজের মধ্যে সাহস বৃদ্ধির প্রয়াস চালান এবং প্রথম বয়স থেকেই তিনি সমূহ বাধা-বিপত্তি ধৈর্য ও বীর্যের সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করেন। সাথে সাথে যখনই নিম্ন-বর্ণিত উপলক্ষের সুযোগ পেয়েছেন তখনই তিনি সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বক্তব্য তুলে ধরতে কোন ক্রুটি করেননি। যেমন:

১–যখন তিনি 'আল উয়াইনা'য় লেখা-পড়া করছিলেন তখন দেখলেন, জনৈক উস্তাদ দর্স শুরু করার পূর্বে দু'আ করতেন এবং এই দু'আয় তিনি হজরত যায়দ ইবনে খাত্তাবের সাহায্য কামনা করতেন। এমতাবস্থায় শায়খ মোহাম্মাদ কেবল স্বীয় উস্তাদকে শুনায়ে নিম্নস্বরে বলে দিতেন: "নিশ্চয়ই আলাহপাক যায়দ(রাজিয়ালাহু আনহু)এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী।"

পরবর্তীতে এই উস্তাদ উক্ত অভ্যাস ছেড়ে দেন। একদিন তিনি শায়খ মোহাম্মাদকে ডেকে পাঠান

এবং যে বিষয়ে অর্থাৎ যে সংস্কার আন্দোলনের তিনি উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন এতে লোকজনের প্রতি তাকে বিনয়ী ও ধৈর্যশীল হওয়ার উপদেশ প্রদান করেন। কেননা, কোন বিষয়ে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা বাতেল হলেও উহার পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টায় ধৈর্য ও সাহসসহ সঠিক জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

২—শায়খ মোহাম্মদ মক্কা শরীফে যখন জ্ঞানার্জনে মশগুল ছিলেন তখন সেখানে কোন এক শায়খের পাঠ-চক্রে তিনি নিয়মিত উপস্থিত হতেন। এই শায়খ মেধা ও আচার-আচরণে শায়খ মোহাম্মদের উপর অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। এই শায়খের অভ্যাস ছিল, পাঠ-চক্র শেষে যখন তিনি আসন থেকে উঠে দাঁড়াতেন তখন বলতেনঃ 'ইয়া কা'বাতুলাহ' অর্থাৎ 'হে আলাহর কা'বা ঘর'। ব্যাপারটি দেখে শায়খ মোহাম্মাদের দৃঢ় ইচ্ছা হলো, তিনি এই আক্বীদাহগত ভূলের প্রতি নমনীয় ভাবে শায়খের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন। তাই, তিনি একদিন অন্যান্য ছাত্ররা উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই শায়খের পাঠ-চক্রে হাজির হলেন এবং তাকে একাকী পেয়ে নম্রস্বরে বললেনঃ 'আমার ইচ্ছে হয়, কোরআন শরীফ থেকে হিফ্জ করা কিছু অংশ আমি আপনাকে পড়ে শুনাই।' শায়খ তাঁর এই প্রস্তাবে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি জানালেন। শায়খ মোহাম্মদ উস্তাদের সম্মুখে 'সূরা কুরাইশ' পাঠ করলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌছলেন ----------অর্থাৎ "সুতরাং তোমরা এই কা'বাগৃহের প্রভুর এবাদত কর।" তখন তিনি ইচ্ছে

করে এর স্থলে পড়লেন ----------অর্থাৎ " সুতরাং তোমরা এই কা'বাগৃহের এবাদত কর।" সাথে সাথে শায়খ আয়াতে ভুল ধরে তা শুদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু শায়খ মোহাম্মদ পরপর তিনবার ইচ্ছা করে ভুল পড়লেন। তখন শায়খ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি তো একজন ধীসম্পন্ন ছাত্র। কেমন করে বারবার একই ভুল করে যাচ্ছ? এটা তো ঠিক নয়। কারণ, এবাদত তো আলাহর জন্য, কা'বাঘরের জন্য নয়।'

তখন শায়খ মোহাম্মদ তাকে বললেনঃ 'আমাকে ক্ষমা করবেন, এই ব্যাপারে আমি আপনার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছি। শায়খ বললেন, আশ্চর্য্য তো! আমি কী বলেছি? উত্তরে শায়খ মোহাম্মাদ তাঁকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যা তিনি দর্সশেষে স্বীয় আসন থেকে উঠার সময় বলতেন। তখন শায়খ বললেন, এটা তো ভুল কথা! আমি না বুঝে অন্যের অনুসরণ করে এ কথাটি বলছি। আলাহ আমাকে ক্ষমা করুন।' এরপর থেকে উক্ত শায়খ তাঁর সেই ভ্রান্ত অভ্যাসটি ছেড়ে দেন। অতঃপর তিনি শায়খ মোহাম্মদকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'ভবিষ্যত জীবন তোমার বিরাাট ভূমিকার অপেক্ষায় রয়েছে। তবে তোমাকে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।'

৩–ইরাকের যুবায়র শহরে অবস্থানকালে সেখান কার লোকগণ শায়খ মোহাম্মদকে বহু নির্যাতন ও কষ্ট প্রদান করে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেখান থেকে

তারা তাড়িয়ে দেয়। কারন, তিনি সেখানে হজরত যুবায়র ইবনে 'আওয়াম (রাঃ) এর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর ওসিলা গ্রহণ করে দু'আ ও কবর মুসেহ করাকে মন্দকাজ বলেছিলেন। উলেখযোগ্য যে, এই যুবায়র ইবনে 'আওয়াম (রাঃ) এর নামানুসারেই উক্ত শহরের নাম 'যুবায়র' রাখা হয়েছে।

৪- যখন তিনি দার'ইয়া শহরে ছাত্রদেরকে তাওহীদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং দৃঢ় আশা পোষন করছিলেন যে, তাঁর ছাত্ররা বিষয়টি যথাযথ ভাবেই অনুধাবন করছে। তাঁর ইচ্ছে হলো, এই বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন। সাধারণতঃ তিনি ফজরের পর দর্‌স দিতে বসতেন। একদিন দর্‌সের শুরুতেই তিনি ছাত্রদের বললেন: 'গতরাত্রে শহরের একটি এলাকায় আমি অনেক হৈচৈ শুনতে পেলাম। সেখানে কী হয়েছে, তোমরা কি জান? ছাত্ররা এই ব্যাপারে খুব উদ্যোগ ও সাহস দেখিয়ে বললো, হতে পারে কোন বাড়ীতে চোর ঢুকে পড়ছিল অথবা কোন ডাকাতের আক্রমণ হয়েছিল, অথবা কোন দুষ্টলোক কারো সম্ভ্রমহানির অপচেষ্টা করছিল।

দ্বিতীয় দিন শায়খ মোহাম্মদ ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন; গতকালকের ঘটনা সম্পর্কে তোমরা কি কোন কিছু জানতে পেরেছ? আর কিছু ঘটলে এর শাস্তি কি হতে পারে? উত্তরে তারা বললো, আমরা তো এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পেলাম না। তবে কিছু হয়ে থাকলে এ কাজের জন্য শিক্ষামূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ছাত্রদের বক্তব্য শুনার পর শায়খ মোহাম্মদ বিষয়টি হালকা করে বললেন, যাতে তারা নিজেদের অন্তরে অন্তরে এর প্রতিফল অনুধাবন করতে পারে। তিনি বললেন, আমি তো বিষয়টি জানতে পেরেছি। আর তা হলোঃ একজন মেয়েলোক মানত করছিল, যদি তার অসুস্থ ছেলে রোগমুক্ত হয়, তা হলে সে জ্বিনের উদ্দেশ্যে একটি কালো মোরগ জবাই করবে। ছেলেটি সুস্থ্য হয়ে উঠলে পর মেয়েলোকটি মানতকরা কালো মুরগটি জবাই করতে স্বামীকে সাহায্য করছিল। হঠাৎ করে মোরগটি হাত থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। লোকজন মোরগটি ধরতে গিয়ে ছাদ থেকে ছাদে দৌড়াতে শুরু করে। অবশেষে, তারা মোরগটি ধরে ফেলে এবং জ্বিনের নাম ব্যতিরেকেই সেটি জবাই করে। যেমন, জনৈক যাদুব্যবসায়ী এই সংবাদ সরবরাহ করে।

বিবরণ শুনে ছাত্রদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়। শায়খ মোহাম্মাদ যখন তাদের এই শান্ত অবস্থা পরিলক্ষিত করলেন, তখন বললেনঃ তোমরা যে তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করছো, তা পুরাপুরি অনুধাবন করতে পারোনি। যখন কার্যটি কোন দুষ্কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল যার উপর ফেক্বাহর কিতাবে শরীয়ত মতে শাস্তি প্রয়োগের কথা রয়েছে, তখন উহা তোমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল। আর যখন বিষয়টি আক্বীদাহ সম্পর্কিত আকারে পেশ করা হলো তখন তোমরা শান্ত হয়ে যাও। অথচ প্রথম বিষয়টি ছিল পাপ, আর দ্বিতীয়টি হলো শির্ক। শির্ক সম্পর্কে আলাহপাক বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আলাহ্পাক তার সাথে শির্ক করা হলে তা তিনি ক্ষমা করবেন না; এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন।"

(সূরা নিসা, আয়াত-৪৮)

সুতরাং আমাদের উচিত, তাওহীদের দর্স প্রথম থেকে পুনরায় শুরু করা। প্রকৃতপক্ষে, এই ঘটনা থেকেই 'কিতাবুত তাওহীদ' অর্থাৎ তাওহীদ গ্রন্থের রচনা ও ছাত্রদের জন্য ইহা পাঠ্য করনের ধারনা জন্মলাভ করে।

শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের ফলে ধর্ম সংক্রান্ত বহু বিষয় জনগণের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। তন্মধ্যে হলো:

সঠিক ও সত্যের প্রতি আগ্রহী ও উহার অনুসন্ধান কারীদের বলা যায় যে, তাদের মত অনেকেই শায়খ মোহাম্মদের কাছে পত্র লিখে তাঁর কার্যক্রম, তাঁর দাওয়াতের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগতি এবং তাদের জানা তাঁর প্রতি আরোপিত বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহের অবসানকল্পে তাঁর জবাব সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা চায়।

শায়খ মোহাম্মাদ কর্তৃক লিখিত পত্রাবলী, যেগুলোর প্রতি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই

বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ সরবরাহ করতে পারে।

এই সব জবাবী পত্রে শায়খ মোহাম্মাদ স্বীয় দূরদর্শীতার দাবী অনুযায়ী তাদেরকে ঐসব শিক্ষার্থীর নামও জানিয়ে দিয়েছেন যারা তাঁর সময়ে তাঁর সম্পর্কে অপবাদ ও সংশয়-সন্দেহ রটনা করেছে এবং এই সম্পর্কে কি করতে হবে তিনি তাদেরকে তাও বলে দিয়েছেন।

এই সব জবাবী পত্রে শায়খ মোহাম্মাদ স্বীয় দূরদর্শীতার দাবী অনুযায়ী তাদেরকে ঐসব শিক্ষার্থীর নামও জানিয়ে দিয়েছেন যারা তাঁর সময়ে তাঁর সম্পর্কে অপবাদ ও সংশয়-সন্দেহ রটনা করেছে এবং এসম্পর্কে কি করতে হবে তিনি তাদেরকে তাও বলে দিয়েছেন।

অপরদিকে, উলামাদের মধ্যে যারা প্রকৃত বিষয় জানার আগ্রহী ছিলেন, শায়খের কাছে লিখিত তাদের পত্রাবলীতে দৃষ্টির গভীরতা ও প্রশ্নের যথার্থতা স্পষ্ট ছিল। তারা শায়খ মুহাম্মদের উত্তর দ্বারা তাঁর উপর বিচার করত। কেননা, তিনি তার উত্তর কোরান ও হাদীছ থেকে শরীয়তী প্রমাণাদি এবং বোধগম্য ও অনুভূত বিষয়াদি থেকে বুদ্ধি বা যুক্তিগত দলীল দ্বারা প্রতিপাদিত করতেন। এদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ আলেমদের কাছে যখনই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তখনই তারা অনুসরণ করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে

সচেষ্ট হয়েছে। তারা শায়খ মুহাম্মদের এই পত্রাবলীকে তাদের জন্য শিক্ষণীয় ও পথপ্রদর্শনের উপকরণ হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। এর প্রমাণ ছারমাদার আলেম মুহাম্মাদ ইবনে ঈদ,(১) ইয়ামনের শায়খ আল-বুকাইলী,(২) মাজমা'আর শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইম(৩) ও অন্যান্যদের কাছে লিখিত শায়খ মুহাম্মদের পত্রাবলীতে স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আর শাসকদের মধ্যে যাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীনের হেফাজত এবং দ্বীন সম্পর্কে উপস্থাপিত নানাবিধ সংশয়-সন্দেহের অপনোদন করা, সে ক্ষেত্রে তারা আলাপ-আলোচনাকেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। আর এ জাতীয় আলাপ-আলোচনা কেবল তাদেরই করা সাজে, যারা সত্য উদ্ভাসিত হলে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। যেমন হয়েছিল মক্কা শরীফের ওলামাবৃন্দের বেলায়, যখন তাদের এবং শায়খ হামদ ইবনে মু'আম্মার ও শায়খ আব্দুল আলী আল হুসাইনসহ দার'ইয়া অঞ্চলের উলামাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে মক্কা শরীফের উলামাদের মধ্যে এই প্রত্যয় ও স্বস্তি জন্ম

----

(১)দেখুন, তাঁর রচনাবলীর এই তৃতীয় পত্র, পৃঃ ২৪-৩০; এই ভাবে দেখুন, তাঁর তৃতীয় পত্র পৃঃ ১৬-২১।

(২)দেখুন, তাঁর রচনাবলীর চতুর্থদশ পত্র পৃঃ ৯৪-৯৮।

(৩)দেখুন, তাঁর একাদশ পত্র পৃঃ ৬২-৭৬ এবং বিশতম পত্র পৃঃ ১৩০-১৪১।

লাভ করে যে, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবের আন্দোলন সঠিক নীতি ও নির্ভুল পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। (১)

মরক্কোর শাসকবর্গের বেলায়ও তা হয়েছিল। শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) মরক্কো বাসীদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখেছিলেন।(২) এরপর অপর একটি পত্রও লিখেছিলেন, যেটি সম্পর্কে আবুল আব্বাস নাছিরী তার 'আল-ইস্তেক্বছা' নামক ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন: 'এই সময়ের ভিতরেই আরব উপদ্বীপে আবির্ভূত ও মক্কা-মদিনা বিজয়ী আবদুল্লাহ ইবনে সাউদ(৩)আল ওহ্হাবীর পত্রও সংরক্ষিত ফাস নগরে পৌঁছে। কেননা, ইবনে সাউদ হারামাইন শরীফাইন দখলের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন-ইরাক সিরিয়া, মিসর ও মরক্কোতে কয়েকটি পত্র পাঠান এবং এর মাধ্যমে সকলকে তাঁর মাজ্হাব ও দাওয়াতের অনুসরণ কারার আহবান জানান।

এরপর গ্রন্থকার সন্দেহ প্রকাশ করেন, মূলতঃ পত্রখানা তিউনিসের উদ্দেশ্যে ছিলো, এবং পরে সেখানকার মুফ্তী উহার কপি করে ফাস নগরে পাঠান; অথবা প্রকৃতপক্ষে পত্রখানা সুলতান মাওলা সুলায়মান আল আলভীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় এবং পরে এর

---

(১)দেখুন, 'আল বয়ানুল মুফীদ' ১ম সংস্করণ সন ১২৪৪হিঃ।
(২) এটি তাঁর ১৭তম পত্র, পৃঃ ১১০-১১৫।
(৩) সম্ভবতঃ সঠিক নাম হলো সাউদ ইবনে আব্দুল আযীয।

একটি কপি তিউনিসিয়ান ওলামাদের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছে।(১)

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলছি। এই পত্রটি ইমাম সাউদ ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) হিঃ ১২২০ সনে মদীনা মুনাওয়ারার উপর কর্তৃত্ব লাভের পর প্রেরন করেন। কেননা, শায়খ মোহাম্মাদের অনেক পূর্বে হিঃ ১২০৬ সনে ইন্তেকাল করেন।

এই পত্রের একটি কপি 'ইসলামিকা' নামক এক জার্মান পত্রিকায় ১৯৩৫ সালের প্রথম সংখ্যার সপ্তম খণ্ডে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। মরক্কোদেশে ওহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কে জার্মান ভাষায় লিখিত জনৈক প্রাচ্যবিদের এক দীর্ঘ প্রবন্ধের সাথে এই পত্রটি প্রকাশিত হয়। তিন পৃষ্ঠার এই পত্রের বিষয়বস্তু ছিলঃ তাওহীদের হক্বীকত বর্ণনা এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবের আন্দোলনের মৌলিক নীতিমালার বিশ্লেষণ।(২)

এই পত্রখানা মরোক্কার আলভী শাসকগণের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করে; যাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৬৩১ইং-১০৪১হিঃ) খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও দূর মরক্কোর সামাজিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে।(৩)

---

(১) 'আল-ইস্তেক্বছা, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৯-১২০

(২) উল্লেখিত ম্যাগাজিনটি দেখুন, যেখানে সেই প্রাচ্যবিদ স্পষ্ট বর্ণনা ও প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে আন্দোলনকে বিকৃত করে চিত্রিত করেছেন।

(৩) দেখুন ডঃ জালাল ইয়াহয়ার গ্রন্থঃ 'আল মাগরিবুল কাবীর' ৩য়খণ্ড ৬৫-৬৬ পৃঃ। আল ইস্তেক্বছার লিখকের মতে ১০৪৫ সন, ৭মখণ্ড ১৫ পৃঃ।

নাছিরী বলেনঃ ১২২৬ হিজরী সনে সুলতান মাওলা সুলায়মান (রহঃ) তার ছেলে উস্তাদ মাওলা আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে সুলায়মানকে 'নবুওতী কাফেলা'র সাথে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে হিজায প্রেরণ করেন। তখনকার দিনে 'নবুওতী কাফেলা' নামে একটি দল এক অভিনব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হজ্জের জন্য ফাস নগরী থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রওয়ানা হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা-বাদশাহগণ এই প্রথার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং উহার জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট আলেম, কাজী, ব্যবসায়ী, কাফেলার নেতা ও গণ্যমান্য লোকদের এমন পর্যায়ে নির্বাচন করতেন যা মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশের হজ্জ কাফেলার সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম হত। সেইবার সুলতান তাঁর ছেলেকে একদল মাগরিবী আলেম ও গণ্যমান্য লোক সমভিব্যহারে এই কাফেলার সাথে প্রেরণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন, ফক্বীহ আল্লামা ক্বাজী আবুল ফজল আব্বাস ইবনে কীরান, ফক্বীহ শরীফ বারাকা মাওলা আমীন ইবনে জা'ফর ও মরক্কোর অন্যান্য উলামাবৃন্দ।(১)

অতপর নাছিরী বলেনঃ যখন মক্কায় ইবনে সাউদের সাথে মাওলা ইবরাহীমের সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি সম্মানিত 'আহ্লে বায়তের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তার কাছে একজন সাধারণ সহচর ও সাথীর ন্যায় বসে পড়েন। আর যিনি তাঁর

----

(১) 'আল-ইস্তেক্বছা লি আখবারিল মাগরিবিল আক্বছা', ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২০।

পক্ষে শরীফের(ইবনেসাউদর)সাথে কথা বলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি হলেন ফক্বীহ কাজী আবু ইসহাক ইবরাহীম জাদাগী। আব্দুল্লাহ ইবনে সাউদ (রহঃ)তাদেরকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত উক্তিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন:'অনেক মানুষ ধারণা করে যে, আমরা সুন্নাতে মোহাম্মদীর বিরোধী। আপনারা কি আমাদেরকে কোন সুন্নাতের বিপরীত কাজ করতে দেখেছেন? আপনাদের সাথে আমাদের এই সাক্ষাতের পূর্বে আমাদের সম্পর্কে কী কী শুনেছেন? তখন কাজী বললেন : আপনারা বলেন: আল্লাহ স্বয়ং সমাসীন। এতে যিনি সমাসীন হন তার দৈহিক অস্তিত্ব জরুরী হয়ে পড়ে। উত্তরে ইবনে সাউদ বললেন : আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, আমরা তো সে কথাই বলি যা ইমাম মালেক (রহঃ) এসম্পর্কে বলে গেছেন: 'আল্লাহ সমাসীন হওয়া জানা কথা, তবে এর ধরন-প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাত এবং এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বেদ'আত।' একথা কি সুন্নাত বিরোধী? তারা বলেন : না, এধরনের কথা তো আমরাও বলি। এর পর কাজী বললেন: আমরা শুনেছি যে, আপনারা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর অন্যান্য নবীভাইগণের কবরের জীবন অস্বীকার করেন। রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা শুনামাত্র ইবনে সাউদ কেঁপে উঠেন এবং উচ্চঃস্বরে রাসুলুল্লাহর উপর দরূদ পাঠ করার পর বলেন:

'আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমরা তো বলি: তিনি কবরে জীবিত আছেন, যেমন অন্যান্য নবীরাও শহীদদের জীবনের চেয়েও উন্নত জীবনে জীবিত রয়েছেন।'

অতঃপর কাজী বললেন: জানতে পেলাম যে, আপনারা তাঁর ও অন্যান্য সকল মৃতের কবর যিয়ারত নিষেধ করেন; অথচ ছহীহ হাদীছে মৃতের কবর যিয়ারতের বৈধতা ছাবেত আছে যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তখন তিনি উত্তর দিলেন : আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, শরীয়াতে যা ছাবেত রয়েছে তা কিভাবে আমরা নিষেধ করতে পারি। আপনাদের কি আমরা নিষেধ করেছি? আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনারা যিয়ারতের আদব-কায়দা ভাল করেই জানেন। আমরা কেবল ঐসব সাধারণ লোকদের যিয়ারত করতে বাধা প্রদান করি যারা আল্লাহর সাথে এবাদতে শিরক করে, মৃতদের কাছে এমন সব উদ্দেশ্য পূরনের আবেদন জানায় যা একমাত্র প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া কেউ পূর্ণ করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো : মৃতকে স্মরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করা, মৃতের পরিণতি দেখে নিজের পরিণতি স্মরণ করা, মৃত্যের জন্য মাগফিরাত কামনা করা, আল্লাহর কাছে তার শাফা'আত চাওয়া

এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করা, যিনি দেওয়া-নাদেওয়ার একচ্ছত্র অধিকারী।(১)

আমাদের ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তো একথাই বলতেন। সাধারণ লোকগণ যখন কার্যতঃ এই অর্থ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে তখন আমরা তাদেরকে যিয়ারত করতে নিষেধ করছি এবং তা শির্কের পথ রোধ করার জন্য। এটা সুন্নাতের খেলাফ হয় কিভাবে?

অতপর দলের নেতা বললেনঃ উপরোক্ত লোকগণ একথাই বলেছেন। আমরা তা দলগত ভাবে জেনেছি এবং পরে অন্যান্যদের সাথে পৃথক পৃথক আলাপ করে জানতে পেরেছি। সুতরাং উভয় দিক থেকে একই ধরনের তথ্য পাওয়া গেল। (২)

এরপর গ্রন্থকার বলেনঃ আমার মতে সুলতান

---

(১)প্রকৃতপক্ষে ইবনে সাউদ একথা বলতে পারেন না। বলা হয়ে থাকেঃ 'সংবাদের আপদ হলো উহার বর্ণনাকারী'। কেননা, একথা তো প্রথম থেকেই অস্বীকৃত যে, মৃতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে শাফা'আত কামনা করা বৈধ নয়; চাই উহা দু'আর মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন ভাবে হোক। মৃত্যুর সাথে সাথে মৃতের আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি কাজের প্রতিফল জারী থাকেঃ একটি হলো-জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়; দ্বিতীয়টি-নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে এবং তৃতীয়টি-ছাদক্বায়ে জারিয়া। বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদীছে উল্লেখিত আছে। দ্রষ্টব্যঃ শায়খ বিন বায রচিত গ্রন্থ- ' আত-তাহক্বীক ওয়াল ই-জাহ', অধ্যায়- আদাবে যিয়ারত।

(২) আল-ইস্তেক্বছা, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১-১২২ দ্রষ্টব্য।

মাওলা সুলায়মান (রহঃ) এধরনের অভিমত পোষণ করতেন। এজন্য তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তিকাটি লিপি -বদ্ধ করছিলেন। এতে তিনি তাঁর সমসাময়িক সুফীদের অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে সুন্নাত থেকে সরে যাওয়া এবং বেদা'আতী কাজে নিমগ্ন হওয়া থেকে সতর্ক করে দেন। তিনি আওলিয়াদের কবর যিয়ারতের আদব-কায়দা স্পষ্ট করে বলে দেন এবং এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে লোকদের হুশিয়ার করে দেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যন্ত কঠোর পন্থায় বিশদভাবে উপদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে প্রতিফল দান করুন।(১)

যেহেতু মরক্কোর রাজা-বাদশাহগণ জ্ঞান ও হেকমতের অনুসন্ধানে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, এ জন্যে যে, উহা মুমিন লোকের কাছে হারানো বস্তুসম, যেখানেই পায় সেখান থেকে সে তা গ্রহণ করে ফেলে, সেহেতু আমরা দেখতে পাই, তারা নিজেদের আক্বীদাহ পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করতে বিভিন্ন পন্থায় সবিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠেন।

এই সুলতান সাইয়িদ মোহম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলভীকেই ফরাসী ঐতিহাসিক শারলী জুলিয়ান আপন উত্তর অফ্রিকার ইতিহাস (আরবী অনুবাদঃ মুহাম্মদ মাযালী ও বশীর ইবনে সালামা) নামক গ্রন্থে

----

(1) উপরোক্ত গ্রন্থ,১২৩ পৃষ্ঠা।

এই বলে প্রশংসা করেনঃ সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ, যিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু পরহেজগার লোক ছিলেন, হাজীদের মাধ্যমে আরব উপদ্বীপে ওহ্হাবী আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার সাধন এবং উহার প্রতি সাউদ শাসকপরিবারের সমর্থন ও সহযোগিতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আন্দোলনের দৃঢ়তায় তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। শুনা যায়, তিনি একদা বলেছিলেনঃ 'আমি মাজহাবের দিক দিয়ে মালেকী এবং আক্বীদাহর দিক দিয়ে ওহ্হাবী'। তার ধর্মীয় আবেগ ও উদ্যোগ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন ও অবেহলার প্রশ্রয় সম্বলিত বই-পুস্তক ধ্বংস করার অনুমতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই সাথে আশ'আরী মতবাদের গ্রন্থসমূহ এবং বিভ্রান্ত বুজাত(১)সম্প্রদায়ের মত ধর্মীয় অনেক খ্বান্কা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি প্রদান করেন। এই সুলতান ১২০৪ হিজরীর রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন।(২)

২-সুলতান সুলায়মানঃ

সুলতান সুলায়মানের তর্ক-বিতর্ক সম্বন্ধে আমরা পূর্বে অবহিত হয়েছি। তিনি এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি মরক্কোর সামাজিক অবস্থা সংশোধনের জন্য সাধারণ লোকদের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে পালন করেন

----

(১) দেখুন, এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৩১১ পৃষ্ঠা।

(২) দেখুন, তাঁর মৃত্যুর খবর আল ইস্কেক্বছা ৮ম খণ্ড ৬৫ পৃঃ।

এবং মরবুতিয়া নামের বিভ্রান্ত সূফী মতবাদ সমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।(১) ১২৩৮ হিঃ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নাছিরী তার আল ইস্তেক্বছা নামক গ্রন্থে সুলতান সুলায়মানের ধর্ম-পরায়ণতা ও জীবন-চরিতের ভূয়ষী প্রশংসা করেন এবং ধর্মহীনতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিরামহীন জিহাদের প্রতি তাঁর উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন।(২) আপন ছেলে মাওলা ইব্রাহীমও তাঁর মত ছিলেন, ইতিপূর্বে যার বর্ণনা করা হয়েছে।(৩)

৩-সুলতান প্রথম হাসান :

তিনি হিঃ ১৩০০ সনে মরক্কো জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত একপত্রে বিগত শতাব্দীর বিদায় জানিয়ে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সাথে সাথে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। এই সম্পর্কে ডঃ আব্বাস আল-জারারী হিঃ ১৩৯৯ সনে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর এক বক্তৃতায় বলেনঃ

'সুলতান প্রথম হাসান চলতি শতাব্দীর প্রথম বছরগুলোতে সালাফী দাওয়াতের উপর মরক্কোতে

----

(১)· দেখুন, মোহাম্মদ কামাল জুম'আ রচিত 'শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের আন্দোলনের প্রচার, পৃষ্ঠা ৩২৭-৩২৮।

(২) উপরোক্ত গ্রন্থ ৮ম খণ্ড ১৬৪-১৬৬ পৃষ্ঠা।

(৩) দেখুন, এই প্রবন্ধের ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা।

বসবাস করেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন মরক্কোর এক সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ আবু শু'য়াইব আল-দাকালী, যিনি বিশ বছরেরও অধিক কাল মক্কায় অবস্থান করেন এবং মক্কার হরমশরীফে হাদীছ শিক্ষা প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পচিশ বছরেরও অধিক সময় সালাফী আন্দোলনের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানে তিনি লোকদের মধ্যে সালাফী মতবাদের ধারণা উপস্থাপিত করেন এবং ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যান।'(১)

উপরোক্ত এই সংস্কারমূলক মতবাদ বা আন্দো লনের প্রতি প্রতিটিস্থানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং বিদ্যার্থীদের কাছে লক্ষ্যের বিশুদ্ধতা ও সততা স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং সেইসব বেদাআত ও কুসংস্কার থেকে লোকদের দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যা সর্বস্থানের বিজ্ঞ উলামাগণের নিকট অস্বীকৃত ও বিবর্জিত ছিল।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে, যখন দেখা গেলো, সর্বস্থানের লোকজন কেবল তখনই পরিতুষ্ট হয়, যখন গ্রহণযোগ্য দলীল সহকারে তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন করা যায়। তাদের কাছে প্রকাশ পেল যে, শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব অন্যান্য ধর্মসংস্কারকগণের ন্যায়ই

----

(১) প্রবন্ধটি পড়তে চাইলে দেখুন, তারজামানাতুল কুবরা পৃ:৪৬৬-৭০

দ্বীনের দাওয়াতকে নবায়ন এবং আক্বীদাহকে ঐসব ফেত্না থেকে নিষ্কলুষ করতে এসেছেন যা, অজ্ঞতা বশতঃ ধর্মে সংযোজিত করা হয়েছিল। এর দ্বারা তিনি চেয়েছিলেন নিজের উপর অর্পিত আমানত পালন করা এবং উম্মতকে নছীহত করা, যাতে লোকগণ তাদের কাজে ও বিশ্বাসে নবীযুগ থেকে নিয়ে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত সালফে সালেহীন দের পথ ও পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে। বস্তুতঃ ঐ শতাব্দির পর থেকে ইসলামী শরীয়তে নবনব বিষয় ও বেদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে, যার পিছনে বিশেষ বিশেষ কারণগুলো ছিলঃ মুসলমানদের উপর অন্যান্য জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, বিশ্বাসগত দিক দিয়ে অন্যান্য জাতির চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং দায়িত্ব পালনে মুসলিম উলামাদের দুর্বলতা।

হিজরী চতুর্থ সনে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমী সম্রাজ্যকে, যার বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিল মরক্কোবাসীরা, মুসলিম সমাজে ব্যাপক ভাবে প্রসারিত বেদাআতের ইতি হাসে সমূদয় অমঙ্গলের সুচনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় মরক্কোবাসী ইবনে আজারা মুররাকিশী কর্তৃক লিখিত 'আল বায়ানুল মাগরীব ফী তারিখিল উন্দুলুস ওয়াল মাগরিব' নামক ইতিহাস গ্রন্থে। লিখক এর মধ্যে তাদের জীবন-বৃত্তান্ত ও চারিত্রিক বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে, এরা নবীতনয়া হজরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশধর ছিল না, বরং এরা ছিল

ইয়াহুদী বংশোদ্ভুত এবং মূলতঃ অবৈধ বংশধর। এরা ইবনে হাল্লাজের সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠি করে এবং তারই নিকট থেকে তারা এই ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করে।(১)

----

(১) ইবনে আজারা কর্তৃক রচিত 'আল-বায়ানুল মাগরিব', ১ম খণ্ড, ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠায় এদের বংশ-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

অতঃপর,

ধর্ম-বিশেষজ্ঞরা (আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন) যখন বলেন: 'প্রত্যেক মানুষই আসলে নির্দোষ'। আর বর্তমান যুগের আইনজ্ঞরা তাদের সুপরিচিত কথায় বলেন: 'অভিযুক্ত অপরাধী নির্দোষ, যতক্ষণ না তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়'। এর চেয়েও বড় সত্যকথা হলো আল্লাপাকের বাণী:

فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

অর্থ: "তখন তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ না করে ফেল এবং পরে তোমরা স্বীয় কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (সূরা-হুজুরাত, আয়াত-৬)

সুতরাং প্রত্যেক আলেম ও শিক্ষার্থীর একান্ত কর্তব্য হলো: যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান ব্যতীত যে কোন কথার পিছনে ধাবিত না হওয়া। কেননা, কোন আলেমের পদস্খলন একটি মারাত্মক বিষয় এবং প্রবৃত্তির তাগিদে পরিচালিত লোকদের অনুসরণ করা তার মর্যাদার পক্ষে হানিকর ও তার ন্যায়পরায়নতার প্রতি কটাক্ষকারী। গুণীজনের সুপ্রাচীন কথা: 'যখন কোন লোক বিচার চেয়ে বলে যে, তার চক্ষু উপড়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তার পক্ষে তুমি রায় দিও না; হয়তবা অপরজনের উভয় চক্ষু উপড়ে দেওয়া হয়েছে।'

এর কারণ হলো: মতামত, বিশ্বাস বা হকের ক্ষেত্রে বাদ-বিবাদ উভয় পক্ষের বিষয়। সুতরাং কোন এক দিক উপেক্ষা করে অপর দিকের প্রতি

গুরুত্ব প্রদান করা ঠিক হবে না। এতে বিচারকর্ম পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য। রায় প্রদান হলো ন্যায় পরায়নতার কাজ। এতে প্রতিপাদন ও ফলাফলের দিকগুলোর যাচাই-বাছাই করা অবশ্য কর্তব্য, যাতে বিচারে কোন পক্ষের উপর জুলুম করা না হয়। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের কর্মপন্থা হলোঃ ভ্রান্তি থেকে জবানকে এবং ভুল থেকে কার্যকলাপের সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

আর এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মানদণ্ড হলো- প্রতিটি বিষয়কে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের উপর উপস্থাপন করা। আল্লাহপাক বলেনঃ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ

অর্থঃ "কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি।"

(সূরা-নিসা. আয়াত-৫৯)

"সত্যই অনুকরণের সর্বাধিক হক্বদার।"

হজরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাঃ) বলেন, ক্ষমার ক্ষেত্রে আমার ভুল শাস্তির ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে উত্তম। তাঁর এ কথার মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না করার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

যদিও পরিভাষাগত এই ওহ্হাবী নামকরণে সম্বন্ধ ও আক্বীদাহগত দিক দিয়ে ভুল হয়ে থাকে, যেমন, শায়খ মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর আরোপিত মতামত ভুল ছিল যা আলাপ-আলোচনা ও লিখা-লিখির মাধ্যমে তারা প্রত্যাখ্যান করছিলেন, তথাপি এই সালাফী আক্বীদাহর পর্যালোচনাকারীগণ সর্বা-পেক্ষা ভাল করেই জানতো যে, এর দ্বারা দ্বীনে ইসলাম প্রবর্তনের মূল দুই উৎস: আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের অনুসরণ-অনুকরণই বুঝানো হচ্ছে। এজন্য তারা এই উপাধির কারনে তেমন কোন অশান্ত অনুভুতি প্রকাশ করেননি। তা এই জন্য যে, তারা ভাল করেই জানতো: যা বলা হচ্ছে তা তো বানোয়াট অপবাদ মাত্র, তর্ক ও আলাপ-আলোচনা দ্বারা তা ছাবেত হওয়ার নয়। এরা তো সেই স্পষ্ট পথের পথিক যার উপর রেখে গেছেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাঁর ছাহাবীগণকে। যে পথ এত পরিস্কার ও আলোকময় যে সেখানে রাত-দিন সমান, এই পথ থেকে কেবল সে ব্যক্তিই বিচ্যুত হয় যার ভাগ্যে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে রয়েছে। এই স্পষ্ট পথ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কথা, কাজ ও স্বীকৃতি থেকে গৃহীত এবং সনদ ও বিশুদ্ধতার নিরিখে যা প্রতিপাদিত।

এই তো ইমরান ইবনে রেজওয়ান, যিনি আরব উপদ্বীপের বাইরের একজন মুসলমান ও তার স্বদেশ ইরানস্থ লাঞ্জা শহরের একজন গণ্যমান্য আলেম; যখন তার কাছে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল

ওহ্হাবের এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের খবর পৌঁছে এবং এই সম্পর্কে তিনি খোঁজ-খবর নেন তখনি এক পংতি কবিতার মাধ্যমে এর প্রশংসা করে বলেন ঃ

إذا كان تابع أحمد متوهّبا فأنا المُقِرُّ بأنني وهَّابِيٌّ

অর্থ:"যদি আহমদ (মুহাম্মদ)এর অনুসরণকারীকে ওহ্হাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়, তা হলে আমি স্বীকার করছি যে, আমি একজন খালেছ ওহ্হাবী।"

মূলতঃ এই উপাধিটির প্রকৃত খবর হলো, যেমন- ইরাকী আলেম মুহাম্মদ বাহজাত আল-আছারী বলেছেন: এটা ছিল ইসলামের শত্রুদের কুমন্ত্রনা প্রসূত। তাদের ধারণা ছিল যে, মুসলিমবিশ্ব এখন মৃতপ্রায়, এতে জীবন-চাঞ্চল্য নেই। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো এর জমি ও সম্পদরাজির যোগ্য উত্তরাধিকার। তাই, তারা মূল আরব উপদ্বীপ থেকে উত্থিত সংস্কারমূলক এই নতুন আন্দোলনকে, যা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য এবং তাদেরকে ধ্বংস থেকে উদ্ধারের বাণী শুনাচ্ছিল, দলীয় কোন্দল বা বিপ্লবের পর্যায়ে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ এর বিপরীত অর্থে উহাকে উপস্থাপন করে ওহহাবী নামে আখ্যায়িত করে এবং প্রসিদ্ব প্রসিদ্ধ প্রচার সংস্থা গুলোর মাধ্যমে এই রূপক উপনাম বিশ্বজুড়ে প্রচার করে দেয়। ফলে বিশ্ববাসীর শ্রবনে ও মুখে মুখে এই আরোপিত নামটি উচ্চারিত হতে থাকে। ওছমানী সাম্রাজ্যের কর্ণধার ও নেতৃস্থানীয় লোকজনের কাছে এই উপাধি পছন্দসই হয় এবং তারা সুফী-দরবেশ ও

লালিত-পালিত খানক্বাবাসীদের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে দেয় এবং এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবতারণা করে। বিশেষ করে, যখন আরবী ইসলামী রাষ্ট্র আপন ভিত্তির উপর অরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তাদের এই অপপ্রচার আর তীব্র ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।(১)

এখানে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রের মাধ্যমে শেষ করতে চাই: একটি হলো, শায়খ সুলায়মান ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব কর্তৃক মাজমা'আর তিনজন আলেমের নামে প্রেরিত পত্র। অপরটি, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব (রহঃ) কর্তৃক ক্বাছীমবাসীদের প্রতি লিখিত পত্র। আক্ষেপের বিষয়, উভয় পত্রেই লিখার কোন তারিখ স্পষ্ট পাওয়া যায়নি। এই শেষোক্ত পত্রে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব তাঁর আন্দালনের পন্থা ও পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যে কারনে, ১৪০৭ হিজরীতে শাবান মাসে মৌরিতানিয়া সফর কালে সেখানকার জনৈক আলেম আমার কাছে এই পত্রটি তলব করেন।

পাঠকগণ যাতে এর দ্বারা উপকৃত হন এবং এর ফলে তাদের সম্মুখে চিন্তাভাবনার দ্বার উন্মোক্ত হয়ে যায়। তারা যেন নিজে নিজেই বিবেক ও বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে সঠিক অভিমত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে

----

(১)দেখুন তাঁর গ্রন্থ:'বর্তমান যুগে তাওহীদ ও সংস্কারের আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাব' পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

উঠতে পারে। তাদের উপর অন্য পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন না হয়; সেজন্যই পত্রদ্বয় অত্র পুস্তকের সংশ্লিষ্ট করে দিলাম। উদ্দেশ্য কেবল সংশোধন ও সংস্কার। যাবতীয় তাওফীক কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট

প্রথমতঃ

পাঠকবর্গের উপকারার্থে শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র এখানে উল্লেখ করছি। পত্রটি তিনি ক্বাছীমবাসীদের এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আক্বীদাহর ব্যাপারে তাঁর দিগদর্শন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া অথবা উহা উলামাদের অভিমতবিরোধী হলে তার পাল্টা জবাব প্রদান করা। ক্বাছীমবাসীরা প্রথম প্রথম তাঁর এই সংস্কারমূলক আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করে। সত্যের অনুসন্ধান এবং সঠিক জ্ঞান ও অনুধাবনের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারীর জবাব প্রদানের ক্ষেত্রে উলামাদের এটাই দায়িত্ব।

এখানে উক্ত পত্রটির পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি পেশ করছি। এই ধরনের আরো অনেক পত্র রয়েছে যা তিনি কোন প্রশ্নকারীর বা তাঁর দাওয়াতের প্রতি সন্দেহ পোষণকারীর উত্তরে লিখেছিলেন। এর ফলে সত্যান্বেষী প্রত্যেক লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া প্রদান করে। কেননা, তারা শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতে এমন কিছু পায়নি যা আল্লাহর শরীয়ত বা নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় উৎসের ক্ষেত্রে উম্মতে ইসলামীর সম্মানিত উলামাবৃন্দের মতামত বিরোধী।

শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব কর্তৃক ক্বাছীমবাসীদের প্রতি তাঁর আক্বীদাহ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে লিখিত

একটি পত্র (১)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল্লাহ তা'আলা ও আমার পার্শ্বে উপস্থিত তার ফেরেস্তাগণ এবং আপনাদেরকে স্বাক্ষী রেখে বলছি:

'আমি তা-ই বিশ্বাস করি যা মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করি, আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেস্তাগণ, তার কিতাব সমূহ, তার প্রেরিত রাসূলগণ ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি এবং বিশ্বাস করি ভাল-মন্দ সহ ভাগ্যের প্রতি।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার কালামেপাক এবং তার রাসূলের ভাষায় নিজেকে যে সব গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত করেছেন সেগুলোর উপর কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নিষ্কৃতি বা বিকৃতি সাধন ব্যতিরেকে বিশ্বাস স্থাপন

----

(১)এই পত্রটি শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের ব্যক্তিগত পত্রাবলী সম্বলিত বিশেষ অংশে প্রকাশ করা হয়েছে। এর সম্পাদনায় ছিলেন: ডঃ মোহাম্মদ বালতাজী, সাইয়্যিদ হিজাব ও শায়খ আব্দুল আযীয রুমী। এটিই প্রথম পত্র, পৃষ্ঠা-১৩(দুরারুস সানিয়্যা ১মখণ্ড, পৃঃ২৮-৩১)

করা। আমি বিশ্বাস করি, মহান পূতপবিত্র আল্লাহ তা'আলার সদৃশ্য কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রুতা সর্বদ্রষ্টা। তিনি যে সব গুণে নিজেকে বিশেষিত করেছেন তার কোনটিও আমি অস্বীকার করি না, তাঁর কোন বাক্যের হের-ফের করি না, তাঁর নাম বা গুণের কোন অপব্যাখ্যা করি না এবং তার গুণাবলীর কোন ধরন-প্রকৃতি নির্দিষ্ট করি না বা তার সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে এগুলোর কোন প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন করি না। কেননা, আল্লাহপাক এমন যে, তার কোন সদৃশ বা সমকক্ষ নেই অথবা তার সমমর্যাদাসম্পন্ন কেউ নেই। কোন সৃষ্টির সাথে তার তুলনা করা চলে না। আল্লাহপাক নিজের ও অন্যের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন এবং কথায় ও কাজে তিনি সর্বাধিক সত্যবাদী ও সর্বোত্তম। তাই তিনি ঐসব বিষয় থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন যাদ্বারা ধরন ও উপমা প্রতিষ্ঠাকারী বিরোধীরা ও তার গুণের অপব্যাখ্যা বা অস্বীকারকারীরা তাকে বিশেষিত করে থাকে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

অর্থ: "ওরা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র ও মহান তোমার প্রভু-প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। সালাম বর্ষিত হোক রাসূল গণের প্রতি।"
(সূরা-আছ্ছাফ্ফাত : ১৮০-১৮১)

নাজাতপ্রাপ্ত মুমিন দলের আক্বীদাহগত অবস্থান হলো-আল্লাহর কার্য্যক্রমের ক্ষেত্রে ক্বাদারীয়া ও

জাবরীয়া মতবাদের মধ্যবর্তী, ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে মুরজিয়া ও ওয়ীদিয়া মতবাদের মধ্যবর্তী, ঈমান ও দ্বীনের ব্যাপারে হারুরীয়া ও মু'তাজিলা এবং মুরজিয়া ও জাহামিয়ার মধ্যবতী স্থানে। এই ভাবে তারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছাহাবীগণের ব্যাপারে রাওয়াফিজ ও খাওয়ারিজদের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে।

আমি বিশ্বাস করি, কোরআন শরীফ আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী, তার কোন সৃষ্ট বস্তু নয়; তার থেকেই আরম্ভ এবং তারই পানে উহার প্রত্যাবর্তন। প্রকৃতপক্ষে, উহা আল্লাহ থেকেই নিঃসৃত বাণী, নাজেল করেছেন তাঁর বান্দাহ, রাসূল, তার ওহীর আমানতদার, তার ও তার বান্দাহগণের মধ্যে তার দূত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।

আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহপাক যা ইরাদা করেন তা নিশ্চয়ই করতে পারেন, তার ইরাদা ব্যতীত কিছুই হয়না, তার ইচ্ছার বাইরে কিছু যেতে পারেনা। বিশ্বজগতে তাঁর তাক্বদীরের বাইরে কিছু হতে পারেনা, যা কিছু সংগঠিত হয় তা কেবল তার ই পরিচালনায় হয়ে থাকে, তাঁর নির্ধারিত তাক্বদীর থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনা এবং লাওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার সীমা কেউ অতিক্রম করতে পারেনা।

আমি বিশ্বাস করি, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুপরবর্তী ঘটনা সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদের প্রতি অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে। সেমতে কবরের ফেতনা ও উহার নেয়ামত এবং দেহসমূহে রূহের প্রত্যাবর্তনের উপর আমি বিশ্বাস করি। কেয়ামতের দিন মানুষ বিবস্ত্র, নগ্নপদ ও খত্নাবিহীন অবস্থায় আল্লাহপাকের সম্মুখে উপস্থিত হবে, সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে এবং বান্দাহগণের আমলসমূহ ওজন করার উদ্দেশ্যে দাড়ি-পাল্লা স্থাপন করা হবে। যাদের পাল্লা ওজনে ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম, আর যাদের পাল্লা ওজনে হালকা হবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্থ এবং জাহান্নামের অধিবাসী। বান্দাহদের মধ্যে তাদের আমলনামা বিতরণ করা হবে, কেউ তা গ্রহণ করবে ডান হাতে, আবার কেউ তা গ্রহণ করবে বাম হাতে।

কিয়ামতের ময়দানে হজরত মোহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দানকৃত পবিত্র হাওজে কাওছারের প্রতি বিশ্বাস করি। এই হাওজের পানি হবে দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র এবং মধুর চেয়েও অধিক সুস্বাদু। আকাশের নক্ষত্ররাজির সমান হবে উহার পিয়ালার সংখ্যা। যে লোক একবার উহার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসায় ভোগবে না। আমি বিশ্বাস করি, পুলছিরাত জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মানুষ আপন আপন কর্মানুসারে উহার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে।

আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শাফা'আতের উপর ঈমান রাখি। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি আখেরাতে প্রথম শাফা'আতকারী হবেন এবং যার শাফা'আতই প্রথম কবুল করা হবে। বেদ'আতপন্থী ও বিভ্রান্ত লোক ব্যতীত নবীজির শাফা'আত কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তবে তাঁর শাফা'আত হবে আল্লাহপাকের অনুমতি ও তাঁর সম্মতি লাভের পর। আল্লাহপাক বলেন ঃ

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

অর্থ: "তাঁরা কোবল ঐসব লোকের জন্য সুপারিশ করবে যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন।"

(সূরা আম্বিয়া-২৮)

আল্লাহপাক আরেকটি আয়াতে বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

অর্থ: "কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর (আল্লাহর) কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া।"

(সূরা বাক্বারা-২৫৫)

আল্লাহ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে বলেন ঃ

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

অর্থঃ "আকাশে বহু ফেরেস্তা রয়েছেন, কিন্তু তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তার জন্য অনুমতি না দেন।" (সূরা নাজ্ম-২৬)

আল্লাহপাক তাওহীদ ছাড়া আর কিছুতেই রাজী নন। তাই, তাওহীদপন্থী ছাড়া আর কারো জন্য তিনি শাফা'আতের অনুমতি দিবেন না। পক্ষান্তরে, মুশরিকদের ভাগ্যে কোন প্রকার শাফা'আত নছীব হবেনা, যেমন আল্লাহপাক বলেন ঃ

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

অর্থঃ "সুতরাং, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনই কাজে আসবেনা।" (সূরা মুদ্দাছ্ছির-৪৮)

আমি বিশ্বাস করি, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহপাক পূর্ব থেকে সৃষ্টি করে রেখেছেন। বর্তমানে এগুলো বিদ্যমান রয়েছে, তা কখনো ধ্বংস হবেনা। মুমেনগণ কিয়ামতের দিন তাদের প্রভু-প্রতিপালককে স্বচক্ষে প্রকাশ্য দেখতে পাবে, যেমন তারা দুনিয়াতে পূর্ণিমার চাঁদ সহজে দেখতে পায়, আল্লাহপাককে দেখতে তাদের কোন ভীড় করতে হবেনা।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর রিসালাত ও নবুওয়াতের উপর বিশ্বাস ব্যতিরেকে কোন

বান্দাহরই ঈমান বিশুদ্ধ হতে পারে না। তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হজরত আবু বকর ছিদ্দীক, তারপর হজরত উমর আল-ফারুক, তারপর হজরত উছমান যুননুরাইন, তারপর হজরত আলী মুর্তাজা, তারপর জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অবশিষ্ট ছাহাবীগণ। অতঃপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীগণ, অতঃপর হুদায়বিয়ার বৃক্ষতলায় 'বাই'আতে রেজওয়ানে' অংশগ্রহণকারী ছাহাবীগণ এবং তারপর অপর ছাহাবীগণের স্থান।

(রাজিয়াল্লাহু আনহুম)

আমি রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছাহাবীগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করি, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করি এবং তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মাগফেরাত কামনা করি। তাদের ভুলত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকি এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সংগঠিত বিবাদ-বিসম্বাদ সম্পর্কে নীরবতা পালন করি। আল্লাহপাকের বাণী অনুসারে আমি ছাহাবীগণের মর্যাদার প্রতি দৃঢ় আস্থা পোষণ করি। আল্লাহপাক বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থ: "যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং

মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখোনা। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, তুমি তো মহা দয়ার্দ্র, পরম করুণাময়।" (সূরা হাশর-১০)

আমি মুমিনদের পুতঃপবিত্র নিষ্কলঙ্ক মাতাগণের (রাসূলের স্ত্রীগণের) জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। আমি কেরামতে আওলিয়া ও তাদের মুকাশাফাতে বিশ্বাস করি। তবে তারা আল্লাহর কোন অধিকার বা হক্ব পাওয়ার যোগ্য নয় এবং যে বিষয়ে তাদের সামর্থ্য নেই সেই বিষয় তাদের কাছে চাওয়া যাবেনা। আমি কোন মুসলমানকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দিতে পারিনা, কেবল তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি যাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবে, আমি নেককারদের জন্য ভাল আশা করি এবং বদকারদের জন্য অমঙ্গলের ভয় করি। কোন পাপের কারনে আমি কোন মুসলমানকে কাফের বলিনা অথবা ইসলামের গণ্ডী থেকে তাকে বের করে দেইনা। প্রত্যেক ইমামের সাথে সে নেক হোক আর ফাসেক হোক জিহাদ চালানোর পক্ষে আমি অভিমত ব্যক্ত করি এবং তাদের পিছনে জামাতে নামাজ পড়া জায়েজ মনে করি।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবের কাল থেকে তাঁর শেষ উম্মাত কর্তৃক দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করা পর্যন্ত ইসলামী জিহাদ অব্যাহত থাকবে, কোন জালেম শাসকের জুলুম বা

ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়নতা তা বাতেল করতে পারবেনা। আমার মতে, মুসলমান ইমাম সে নেক হোক আর ফাসেক হোক তার আনুগত্য ওয়াজেব, যতক্ষণ না সে আল্লাহপাকের নাফরমানীর নির্দেশ প্রদান করে। কেউ যদি খেলাফতের পদ অধিকার করে এবং লোকগণ তাকে সমর্থন দিয়ে দেয় ও তার উপর তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায় তা হলে তার অনুগত থাকা লোকগণের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয হয়না। আমার মতে বেদ'আতীদের পরিত্যাগ করা এবং তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। তাদের উপর বাহ্যিকভাবে শরী'অতের হুকুম কার্যকর করি এবং তাদের গোপণীয় বিষয়াদি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেই। আমার বিশ্বাস, ইসলামে নতুন প্রবর্তিত প্রতিটি বিষয়ই বেদা'আত।

আমি বিশ্বাস করি যে, ঈমান হলোঃ 'মুখের কথা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ও আন্তরিক বিশ্বাস' এই তিনের সমষ্টি। আল্লাহর আনুগত্যে ঈমান বৃদ্ধি পায় এং তাঁর নাফরমানীতে উহার ক্ষয় হয়। ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে; সর্বোচ্চ শাখা হলো কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আর সর্বনিম্ন শাখা হলো-'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা'। আমার মতে, পবিত্র শরী'অতে মুহাম্মাদীর বিধান মতে প্রত্যেকের উপর সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা ওয়াজেব।

এই হলো আমার ধর্ম-বিশ্বাস বা আক্বীদাহ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যা আমি লিখে পাঠালাম। আমার বক্তব্য সম্পর্কে আপনাদের অবগতির জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহ পোষণ করছি। আমি যা বলছি, তার উপর আল্লাহ সাক্ষী রইলেন।

তারপর, আপনাদের অজানা থাকার কথা নয়, আমি জানতে পেরেছি যে, সুলাইমান ইবনে সুহাইমের পত্র আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছে এবং আপনাদের মধ্য থেকে কোন কোন আলেম নামধারী লোক তা গ্রহণ ও সত্যায়ন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ জানেন যে, লোকটি আমার প্রতি অনেক বিষয় মিথ্যা আরোপ করেছে, যা আমি কখনও বলিনি। তার অধিকাংশ কথা আমার ধারণায়ও আসেনি। তন্মধ্যে তার কয়েকটি অপবাদ হলো :

'আমি চার মাজহাব বাতেল করে দিয়েছি এবং আমি বলেছিঃ মানুষ বিগত ছয়শত বৎসর থেকে সঠিক পথে চলেনি, আমি ইজতেহাদের দাবী করেছি, আমি তাক্বলীদ মানিনা, আমি বলেছি- আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দুর্ভাগ্যের বিষয়, নেক লোকদের ওসীলা যারা গ্রহণ করে তাদেরকে আমি কাফের বলি, আমি বুছাইরীকে কাফের বলি, কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ 'হে সৃষ্টির সেরা দাতা'। আমি বলেছি, আমার সামর্থ্য থাকলে নবীজির কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত গম্বুজ ধ্বংস করে দিতাম। আমার সামর্থ্য থাকলে কাবাশরীফের বর্তমান মীযাব খুলে একটি কাঠের মিযাব লাগিয়ে

দিতাম। আমি নবীজীর কবর যিয়ারত করা হারাম বলেছি, আমি পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের কবর যিয়ারত খারাপ মনে করি। যে গয়রুল্লাহর নামে শপথ করে তাকে আমি কাফের বলি। আমি ইবনুল ফারিজ ও ইবনুল আরবী উভয়কে কাফের বলি। আমি দালাইলুল খায়রাত ও রাওজুর রায়াহীন নামের কিতাবদ্বয় জ্বালিয়ে পুড়েছি এবং শেষোক্ত কিতাবটিকে রাওজুশ্‌শায়াতীন নামে আখ্যায়িত করেছি।'

উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার প্রতি আরোপিত অপবাদের উত্তরে আমি বলিঃ 'সুব্‌হানাকা, হাজা বুহ্‌তানুন আজীম'।

سبحانك ، هذا بهتان عظيم

অর্থঃ "হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে বলছি-এটা এক গুরুতর অপবাদ"। (সূরা নূর-১৬)

ইতিপূর্বে অনেকেই প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে বলেছিল, তিনি হজরত ঈসা ইবনে মারয়াম(আলাইহাস সালাম)কে গালি দিতেন এবং এইভাবে নেক লোকদেরও গালি দিতেন'। মিথ্য কথার প্রচার ও অপবাদ তৈরির ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সাদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহপাক বলেন ঃ

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

অর্থ: "যারা আল্লাহর নিদর্শন সমুহ বিশ্বাস করে না, তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং এরাই মিথ্যাবাদী লোক।" (সূরা নাহ্‌ল-১০৫)

তারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আরো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলেছিল যে, তিনি বলেছেন : ফেরেস্তাগণ, ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও উযাইর (আলাইহিস সালাম) জাহান্নামে যাবেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

অর্থ: "যাদের জন্য আমার নিকট পূর্ব হতে কল্যাণ নির্দ্ধারিত রয়েছে তাদেরকে সেই জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে।" (সূরা আম্বিয়া-১০১)

আর অন্যান্য বিষয়গুলো যা আমি বলছি: কোন মানুষের ইসলাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর অর্থ অনুধাবন করবে। আমার কাছে যে আসে আমি তাকে এর অর্থ বুঝিয়ে দেই। আমি সেই মানতকারী ব্যক্তিকে কাফের বলি যে তার মানতের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা পোষণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে নজর গ্রহণ করে। গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে জবাই করা কুফরী কাজ এবং এই জবাই করা পশুর মাংশ খাওয়া হারাম। এই বিষয়গুলো সত্য। আমি এই কথাগুলো বলি। এর পক্ষে আল্লাহর কালামে পাক, হাদীছে রাসূল এবং চার ঈমাম সহ অনুসরণযোগ্য উলামাগণের বাণী

থেকে আমার কাছে বহু দলিল-প্রমাণাদি মওজুদ আছে। আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে আমি একটি পৃথক পত্রে এই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব, ইন্ শা আল্লাহ।

আপনারা আল্লাহপাকের নিম্নোক্ত বাণীটি পড়ুন এবং অনুধাবন করুন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا

عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

অর্থঃ "হে মুমেনগণ, যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন লোকদের ক্ষতিগ্রস্থ না কর এবং পরে তোমরা স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"

(সূরা হুজুরাত-৬)

দ্বিতীয়তঃ

'মিছবাহুজ জালাম' কিতাবের লিখক শায়খ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান বলেনঃ আল্লাহপাকের মেহেরবাণীতে ইতিমধ্যে সুলায়মানের পত্রখানা আমার গোচরে এসে গেছে। এই পত্রে রয়েছে তার পুর্ববর্তী মতবাদ ত্যাগ করার সুখবর এবং জানা যায়, তার কাছে তাওহীদ ও ঈমানের মর্মার্থ স্পষ্ট হওয়ার পর তিনি তার ভ্রান্ত ও সীমালংঘনজনিত

কার্যকলাপের জন্য লজ্জিত হয়েছেন।' (পৃষ্ঠা ১০৪-১০৮) পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সুলায়মান ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাবের পক্ষ থেকে:-

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দঃ হামদ ইবনে মুহাম্মদ আল-তুয়াইজরী এবং উছমান ইবনে শাবানার পুত্রদ্বয় আহমদ ও মুহাম্মদে প্রতি:-

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

'বাদ খবর এই যে, আপনাদের প্রতি আমি সেই আল্লাহপাকের প্রশংসা ঘোষণা করছি, যিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহপাক আমাদের ও আপনাদের উপর মেহেরবাণী করে তার দ্বীন ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত বিষয়াদির জ্ঞান দান করেছেন। এরদ্বারা তিনি আমা দেরকে অন্ধ থেকে চক্ষুস্মান করে দিয়েছেন এবং গুমরাহী থেকে উদ্ধার ও মুক্ত করেছেন। আরো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, দার'ইয়ায় আমাদের কাছে আপনাদের আগমনের পর আপনারা সঠিকভাবে সত্য জানতে পেরেছেন। এরদ্বারা আপনারা ঈমানের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছেন এবং গুমরাহী থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। এটিই তো আমাদের সভা-সমিতিতে

আপনাদের প্রশংসিত আচরণ। যারাই আমাদের কাছে এসেছেন তারা আলহাম্‌দুল্লিাহ আপনাদের প্রশংসা করেছেন। এজন্য আল্লাহপাকের প্রশংসা জ্ঞাপন করি।'

এরপর আরো দুটি পত্র লিখেছিলাম আপনাদেরকে স্মরণ ও উৎসাহিত করার জন্যে। কিন্তু ভাইগণ, আমাদের পক্ষ থেকে সত্যের বিরোধিতা, শয়তানের আনুগত্য ও সঠিক পথ অনুসরণে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সেগুলো আপনাদের জেনে রাখা দরকার।

এখন তো আপনাদের জানা হয়ে গেল যে, আমাদের জীবন আর বেশি বাকী নেই, আছে মাত্র কয়েকটি দিন। আল্লাহর কাছে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। আশা করি, আমরা আল্লাহর পথে জিহাদে উঠে দাঁড়াবো এবং গুমরাহীর পথে পূর্বে যা করেছি তার চেয়ে হেদায়েতের পথে আরো বেশি সংগ্রাম করবো। আর একাজ হবে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে যার কোন শরীক নেই। অন্য কারো উদ্দেশ্যে করবো না। আশা করি, আল্লাহপাক অনুগ্রহ করে আমাদের অতীত ও অবশিষ্ট জীবনের পাপরাশি মুছে দিবেন।

আল্লাহর পথে জিহাদের মহাত্ম্য ও পাপ মোচনে উহার ভূমিকা আপনাদের জানা আছে। এই জিহাদ হয় হাত, ভাষা, অন্তর ও সম্পদের দ্বারা। অনুধাবন করুন, যার মাধ্যমে একজন লোক হেদায়াত লাভ

করে তার জন্য আল্লাহর কাছে কিরূপ প্রতিফল রয়েছে।

আপনারা এখন আল্লাহর পথে যতটুকু জিহাদ করেছেন তার চেয়েও বেশি আপনাদের করা চাই। সত্যিকারভাবে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য উঠে যান, লোকদের কাছে সুনিপুণ পন্থায় হিকমতের সাথে সত্য পৌঁছিয়ে দিন এবং তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিন যে, তারা পূর্বে কোন্ পর্যায়ের অজ্ঞতা ও গুম্‌রাহীর মধ্যে নিপতিত ছিল।

আল্লাহ! আল্লাহ! ভাইগণ, বিষয়টি এর চেয়েও অনেক বড়। আমরা যদি আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে মাঠে-ময়দানে বের হয়ে পড়ি এবং লোকগণ আমাদেরকে মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানশুন্য হিসেবে গণ্য করে তা হলে আমাদের পক্ষ থেকে এটা বেশী কিছু হবে না।

আপনারা স্বস্ব মহলে লোকদের কাছে দ্বীন-দুনিয়ার নেতা-কর্মকর্তা এবং শায়খদের চেয়েও অধিক প্রিয়। সাধারণ লোকগণ আপনাদের অধিনস্ত। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করুন, নিষিদ্ধ কাজ বা সত্যের পথে কোন বাধা-বিপত্তি যেন আপনাদেরকে দুর্বল না করে ফেলে।

আপনারা জানেন, সৎকাজের আদেশকর্তা ও অসৎকাজে নিষেধকর্তা অবশ্যই বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে। আমি আপনাদেরকে এরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছি। যেমন,

আল্লাহর নেক বান্দাহ হজরত লোকমান কর্তৃক তাঁর ছেলের প্রতি উপদেশবাণীতে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর জন্য মহাব্বত ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ এবং আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা; এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

আপনারা দেখতে পাবেন, এই ব্যাপারে অনেক শয়তানী চক্রান্ত সম্মুখে উপস্থাপিত হতে পারে। তা হলোঃ লোকজনের মধ্যে কেহ যখন এই দ্বীনের প্রতি সম্পর্কিত হয় তখন শয়তান আপনাদের ভিতর এই সন্দেহ ঢুকাতে পারে যে, লোকটি সত্যিকার ধর্মপ্রাণ নয়, এর পিছনে নিশ্চয়ই পার্থিব কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ইহা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহপাক ব্যতীত আর কেউ জানতে পারে না। সুতরাং কেউ যদি মঙ্গল প্রকাশ করে তা কবুল করে নিন এবং তার প্রতি বন্ধুত্ব স্থাপন করুন; পক্ষান্তরে, কারো মধ্যে অমঙ্গল দেখা দিলে বা ধর্ম থেকে পশ্চাদগতি পরিলক্ষিত হলে তাকে শত্রু মনে করুন এবং তাকে ঘৃণা করুন, যদিও সে আপন প্রিয়জন হয়ে থাকে।

এই ব্যাপারে মুদ্দা কথা হলো, আল্লাহপাক আমাদেরকে কেবল তারই এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন; এতে তার কোন শরীক নেই। তিনি অপন করুণা বশতঃ আমাদের প্রতি তার রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদের প্রতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর এবাদত সম্পাদনের নির্দেশ দেন এবং উহার পদ্ধতি বর্ণনা করেন। আর সবচেয়ে

জঘণ্যতম যে বিষয়টি তিনি নিষেধ করেন তা হলো- 'আল্লাহর সাথে শিরক এবং আল্লাহওয়ালাদের সাথে শত্রুতা'। তিনি আমাদেরকে হক ও বাতেল স্পষ্ট করে বলার নির্দেশ দেন। যে ব্যক্তি রাসূলের শিক্ষা ও নির্দেশাবলী সঠিকভাবে পালন করবে সে আপনার ভাই, যদিও সে অন্যের কাছে ঘৃণ্যতম ব্যক্তি হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি ছিরাতে মুস্তাক্বীম হতে বিচ্যুত হবে সে আপনার শত্রু, হোক না সে আপনার ছেলে বা সহোদর ভাই।

এটি এমন একটি বিষয়, যা আমি আপনাদেরকে বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। অথচ আল্‌হামদু লিল্লাহ, আমি জানি, এ সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। এতদসত্বেও সংশয়হীন অবস্থায় পূর্ণভাবে সত্য প্রকাশে আপনাদের কোন ওজর থাকার কথা নয়। আপনাদের উচিত, আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে যা সংগঠিত হয়েছে তা আপনাদের সভা-সমিতিতে উল্লেখ করা এবং বাতেলের সাথে পূর্বেকার সহযোগিতার চেয়েও অধিক পরিমাণে সত্যের পথে সংগ্রাম করা। এরচেয়ে অধিক সত্য আর কি হতে পারে? এর উপর আপনাদের কোন ওজর থাকতে পারে না। কেননা, আল্‌হামদু লিল্লাহ, আজ এই সত্যের সংগ্রামে দ্বীন ও দুনিয়ার সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং পূর্বে কি অবস্থায় ছিলেন তা পরস্পর মিলে স্মরণ করুন, দুনিয়ার বিষয়ে আপনারা কিভাবে ভয়, কষ্ট এবং জালেম ও ফাসেকদের নির্যাতন ও আধিপত্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন। অতঃপর আল্লাহপাক দ্বীনের

বদৌলতে এগুলো থেকে মুক্ত করে আপনাদেরকে জনগণের শাসক ও নেতা বানিয়ে দিলেন। আল্লাহর রহমতে এসব হলো হেদায়াতের পথিকৃত ও শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের দাওয়াতেরই সুফল।

অতঃপর স্মরণ করুন সেই সব ধর্মীয় নিয়ামতের কথা যা আল্লাহপাক আমাদের দান করেছেন। একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন যেটি সম্পর্কে আমরা এই দাওয়াত প্রচারের পূর্বে অজ্ঞতার মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম। আর সেটি হলো, বেদুইনদের উপর ইসলামের হুকুম জারী করা, অর্থাৎ তাদেরকে মুসলমান হিসেবে স্বীকার করা। অথচ আমাদের জানা রয়েছে যে, ছাহাবীগণ আহ্লে রিদ্দার সাথে যুদ্ধ করেছেন; যদিও তাদের অধিকাংশ লোক ইসলামের কথা বলতো এবং তাদের মধ্যে অনেকেই তো আরকানে ইসলাম পালন করতো। এও আমাদের জানা রয়েছে যে, যে লোক কোরআনের একটি অক্ষরের উপর মিথ্যা আরোপ করবে সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে এবাদতগুজার হয়ে থাকে। এই ভাবে যে ব্যক্তি ধর্ম নিয়ে অথবা ধর্মীয় কোন বিষয়ের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি বা বিদ্রূপ করবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সর্বস্বীকৃত কোন ধর্মীয় নির্দেশ অস্বীকার করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। এই জাতীয় আরো অনেক কুফরী বিষয় রয়েছে যা বেদুঈন সামাজে বিদ্যমান, অথচ আমরা বিনা দলিলে চিরাচরিত প্রথায় তাদেরকে মুসলমান বলে অভিহিত করে চলছি।

ভাইগণ, এই মৌলিক নীতি সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং পরস্পর আলোচনা করুন, তাহলে বিষয়টি এর চেয়েও বেশি আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আমার বিশ্বাস, যে সব বিষয়ে আপনাদের সতর্ক করা হয় সেইসব বিষয় গ্রহণে আপনাদের কোন দ্বিধা থাকবেনা। স্বয়ং আমার ও আপনাদের জন্য নছিহত বাণী এবং মৌলিক কথা হলো, দিনরাত আল্লাহ পাকের আশ্রয় কামনা করবেন, যেন তিনি আপনাদেরকে নফসের অনিষ্ট ও আমলের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন, ছিরাতে মুস্‌তাকীমে (সঠিক সরল পথে) পরিচালিত করেন, যে পথে চলে গেছেন নবী-রাসূল ও নেক বান্দাহগণ এবং তিনি যেন ফেতনা-ফ্যাসাদের গ্লানী থেকে আমাদের সবাইকে নিরাপত্তা দান করেন। সত্য স্পষ্ট ও উদ্ভাসিত এবং সত্যের পর ভ্রান্তি বৈ আর কিছু নেই।

আল্লাহ আল্লাহ, আপনাদের এলাকার লোকগণ তো মঙ্গলে-অমঙ্গলে আপনাদেরই অনুসরণ করে। যা উল্লেখ করলাম তা যদি আপনারা পালন করেন তা হলে কারো সাধ্য নেই যে আপনাদের অমঙ্গল ঘটাবে। দিশেহারা লোকদের জন্য আপনারা হবেন পথপ্রদর্শকের প্রতীক। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করেন।

শায়খ মুহাম্মদ, তাঁর ও আমাদের পরিবার-পরিজন আলহাম্‌দুলিল্লাহ কুশলেই আছেন। সবাই

আপনাদের প্রতি সালাম জানাচ্ছেন। আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রিয়জনদের কাছে সালাম জানাবেন। আল্লাহপাক প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের উপর সালাম ও দরূদ বর্ষণ করুন। আল্লাহপাক এই পত্র লিখক, তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির জন্য ক্ষমা দান করুন এবং সেই মুসলিম নর-নারীর জন্যও ক্ষমা দান করুন যারা এই পত্র পাঠ করে লিখকের জন্য মাগফিরাত কামনা করে।

(এরপর শায়খ সুলায়মান উল্লেখ করেন যে, এর উত্তরে তারা উল্লেখযোগ্য একটি পত্র পাঠায়, যার মধ্যে ইতিবাচক উত্তম জবাব সন্নিবেশিত ছিল। এরপর তিনি উহার উল্লেখ করেন।)

তৃতীয়তঃ

মরক্কোবাসীদের উদ্দেশ্যে শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) এর একটি পত্র

সম্ভবতঃ আলোচিত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রের সংযোজন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে মনে করি। পত্রটি শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মরক্কোবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। এই পত্রে তিনি আল্লাহর জন্য এখলাছের সাথে এবাদত করা এবং আল্লাহর তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদকে পরিচ্ছন্ন রাখার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই বিষয়টি অত্যন্ত প্রাল ভাষায় বর্ণনা করেন। একথা জানা গেল যে, সদ্ভাব ও পরিতুষ্টির উপাদানই ইমাম ও মাওলা ইব্রাহীমের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেছিল, যা হিজ্‌রী ১২২৬ সনে হজ্জ মাওসুমে আগত মাওলা ইব্রাহীমের নেতৃত্বে মরক্কোর উলামাবর্গ ও ইমাম সাউদ ইবনে আব্দুল আযীযের মধ্যে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ আলাপ–আলোচনা ও তর্ক–বিতর্কের পর অর্জিত হয়। যে বিষয়গুলোর প্রতি তাঁরা উভয় আহ্বান জানান সে সব বিষয়ের সত্যতায় তাদের পরিতুষ্টি লাভ হয় এবং শায়খ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রচারিত বিভিন্ন সংশয়–সন্দেহ নিরসনের পর মাওলা ইব্রাহীম ও তাঁর সাথী আলেমগণ মক্কায় অবস্থানকালেই তাদের যাবতীয় ভুলবুঝাবুঝির অবসান ঘোষণা করেন। পত্রটি হুবহু এখানে উদ্ধৃত করা হল :–

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি এবং তারই কাছে তাওবা করি। আমরা আমাদের অন্তরের কুপ্রবৃত্তিসমূহ হতে ও আমাদের মন্দ আমলগুলো হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে সৎপথে পরিচালিত করার সাধ্য কারো নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের সত্যিকার কোন উপাস্য নাই, তাঁর কোন শরীক নেই ; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি: মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চিত সঠিক পথে চলে; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে সে নিশ্চিত বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয় এবং সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। এতে আল্লাহর কোনই ক্ষতি হয় না।

আল্লাহপাক হজরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি, তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি বহুল পরিমাণে দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থ: "(হে রাসূল) বলে দিন, এই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে সজ্ঞানে দাওয়াত দিচ্ছি—আমি ও আমার অনুসারীগণ। আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করি এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা য়ূসুফ—১০৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

অর্থ: "(হে রাসূল) বলেন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তা হলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, ফলে, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমা দের পাপ মার্জনা করে দিবেন।" (সূরা আলে ইমরান—৩১)

আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থ: "আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর—৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সুসম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"

(সূরা মায়েদাহ–৩)

এখানে আল্লাহ্পাক সংবাদ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এবং স্বীয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে তা সুসম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আর আমাদের প্রতি আমাদের প্রভু–প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা নাজেল করা হয়েছে তা মেনে চলার এবং বেদ'আত, পরষ্পর বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ পরিহার করে চলার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

অর্থ: তোমরা অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রভু–প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর বন্ধুদের অনুসরণ কর না। তোমরা অল্পই নছীহত কবুল করে থাকে।"

(সূরা আ'রাফ–৩)

আল্লাহ্পাক আরো বলেন ঃ

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: "আর এটিই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এপথে চল এবং অন্যান্য পথে চল না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে আল্লাহ এই ওছিয়ত করলেন, যাতে তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো।"

(সূরা আন'আম—১৫৩)

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর দিয়েছেন যে, 'তাঁর উম্মত বিঘতে বিঘতে বাহুতে বাহুতে পূর্ববর্তী যুগবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।'

বোখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে ছাবিত আছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

((لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا : يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال : فمن ؟))

অর্থ: 'তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সুন্নাতগুলো সমানে সমানে অনুসরণ করবে। এমন কি তারা যদি করে থাকে তা হলে তোমরাও তাতে প্রবেশ গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করবে।' ছাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি ইয়াহুদ—নাছারাদের কথা বুঝাচ্ছেন ? তিনি বললেন: তা হলে আর কারা ?"

অন্য একটি হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর উম্মত তেয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।

এদের মধ্যে একটি দল বাদে অপর সবকয়টি দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সে দলটি কারা? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন: এরা হল সেইদল, যারা সেই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত যে পথের উপর আজ আমি ও আমার ছাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।”

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর্যুক্ত বাণীগুলো জানার পর আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কি ভাবে মারাত্মক মারাত্মক বিপদাপদ ব্যাপকভাবে আমাদের সমাজকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক ঘটনা হল: আল্লাহর সাথে শিরক করা, মৃতের কবরে গমন করে তার কাছে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করা, বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণার্থে এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাদের কাছে আবদার করা, যে সব বিপদাপদ থেকে রেহাই দেওয়ার সামর্থ্য পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর প্রভু—প্রতিপালক ব্যতীত আর কারো নাই।

এই ভাবে মৃতদের উদ্দেশ্যে মানত ও কোরবাণীর মাধ্যমে তাদের সান্নিধ্য কামনা করা এবং বিপদাপদ দূরীকরনার্থে ও বিভিন্ন প্রকার উপকার হাছেলের জন্য এবং এই জাতীয় আরো অনেক এবাদত যা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য নিবেদিত করা বৈধ নয়, সবগুলোই শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ব্যতীরেকে কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করার অর্থ হলো সব এবাদতই গয়রুল্লাহর জন্য নিবেদিত করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এবাদতের ব্যাপারে কোন প্রকার অংশীদারীত্বের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ পাক কেবলমাত্র সেই কাজই কবুল করেন যা তার জন্য খালেছ ভাবে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

অর্থ: "অতএব, তুমি আল্লাহ্‌র এবাদত কর তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। জেনে রাখ, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে রেখেছে, তারা বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এজন্যেই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়ছালা করে দিবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

(সূরা যুমর—২—৩)

এইভাবে আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি কেবল সেই ধর্মকাজই কবুল করেন, যা তার জন্য খালেছভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তিনি আমাদেরকে আরো জানিয়ে দিলেন যে, মুশরিকরা ফেরেস্তা, নবী ও মৃত নেকলোকদের কাছে প্রার্থনা জানায় এই উদ্দেশ্যে যে, এরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে এবং তাঁর কাছে তাদের জন্য শাফা,আত করবে। তিনি আরো জানিয়ে দিলেন যে, যে মিথ্যুক ও কুফ্‌রীতে অনড় থাকে আল্লাহ্‌পাক তাকে কখনও হেদায়াত দান করেন না। আল্লাহ্‌পাক তাদের এই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও তাদের কুফ্‌রী ছাবিত করে বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

অর্থ: "যে মিথ্যুক ও কুফ্‌রীতে অনড় থাকে আল্লাহ্ পাক তাকে কখনও হেদায়াত দান করেন না।" (সূরা যুমর- ৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِى السَّمٰوَاتِ وَلاَ فِى الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: " এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর এবাদত করে যা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না বা কোন উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, উহারা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের শাফা'আত কারী। (হে রাসূল) তাদেরকে বল: তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকা- শমণ্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে এমন কোন বিষয়ে অবহিত করছ যা তিনি জানেন না ? তিনি পূত-পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে উহা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে।" (সূরা য়ূনুস-১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলে দিয়েছেন- যে কোন ব্যক্তি তার মধ্যে ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কাউকে শাফা'আত তলব করার জন্য মাধ্যম বানিয়ে নিল, প্রকৃতপক্ষে সে তারই এবাদত করল এবং তাকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে নিল। কেননা, সর্বপ্রকার শাফা'আত আল্লাহ্‌রই অধিকারভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

অর্থ: "(হে রাসূল) বলে দাও: সমস্ত শাফা'আত আল্লাহরই অধিকারভুক্ত।" (সূরা যুমর—৪৪)

সুতরাং তাঁর অনুমতি ব্যতীরেকে কেউ কারো জন্য কোন প্রকার শাফা'আত করতে পারবে না।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

অর্থ: তাঁর কাছে কেউ তাঁর অনুমতি ব্যতীরেকে শাফা'আত করতে পারবে না।" (সূরা বাক্বারা—২৫৫)

আল্লাহপাক বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

অর্থ: "দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন, সে ছাড়া সেদিন কোন শাফা'আত কারো উপকারে আসবে না।" (সূরা তাহা—১০৯)

আর পূতপবিত্র আল্লাহপাক তার তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর

কিছুতেই তিনি রাজী হন না। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

অর্থ: "তারা শাফা'আত করবে শুধু ওদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া–২৮)

আল্লাহ্‌পাক আরো বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

অর্থ:(হে নবী) বল, তোমরা আহ্বান কর ওদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ মনে করতে। ওরা তো আকাশ–মণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণুপরিমাণ কোন বস্তুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে ওদের কোন অংশও নেই এবং ওদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো শাফা'আত ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবা–২২ ও ২৩)

সুতরাং শাফা'আত একটা হক্ব এবং তা এই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যায় না।

আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

অর্থ: "এবং এই মসজিদসমূহ আল্লাহরই এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।

(সূরা জিন্ন—১৮)

আল্লাহপাক আরো বলেন ঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থ:"এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকো না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না এবং অপকারও করতে পারবে না, আর যদি তা কর তা হলে তুমি তখন জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

(সূরা য়ূনুস—১০৬)

লক্ষণীয় যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শাফা'আতকারী, 'মাক্বামে মাহমুদ' এর হক্বদার এবং হজরত আদম ও তাঁর পরবর্তী নবী—রসূলগণ যার পাতাকার অনুসারী, তিনিও আল্লাহর বিনা অনুমতিতে শাফা'আত করতে পারবেন না। আর সৃষ্টির সেরা হজরত মোহাম্মদ(ছাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম) ক্বিয়ামতের দিন শুরুতেই শাফা'আত করবেন না। বরং "তিনি আরশের নিচে যাবেন, সেখানে গিয়ে সিজদায় পড়ে আল্লাহর শিখানো বাক্যাবলীর দ্বারা তার প্রশংসা করবেন। এরপর তাঁকে বলা হবে: 'হে মুহাম্মদ মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে, চাও তোমাকে দেওয়া হবে এবং শাফা'আত কর তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে।' এরপর তাঁর জন্য উম্মতের এক নির্দিষ্ট সংখ্যায় উম্মতের শাফা'আত সীমাবদ্ধ করে দিলে আল্লাহ পাক তাদেরকে

বেহেস্তে দাখেল করে দিবেন ।”

হজরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবস্থা যখন এই, তখন অন্যান্য নবী–ওলীগণের অবস্থান সহজেই অনুমেয়।

এ পর্যন্ত যা বলা হল সে সম্পর্কে কোন মুসলিম আলেমের দ্বিমত নেই; বরঞ্চ এর উপর সালাফে ছালেহীন, ছাহাবায়ে কেরাম, সম্মানিত তাবেঈন, বিজ্ঞ চার ইমাম এবং তাদের মত ও পথের সঠিক অনুসারীগণের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে।

আর নবী–আওলিয়াগণের মৃত্যুর পর তাদের কাছে শাফা'আত তলব করা, তাদের কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করা, উহার পার্শ্বে বাতি প্রজ্জ্বলিত করা ও সেখানে নামাজ পড়া, কবরের পার্শ্বে আনুষ্ঠানিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত করা, কবরের পরিচর্যা ও সংরক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও দ্বাররক্ষক নিয়োগ করা, উহার উদ্দেশ্যে মানত পেশ করা ইত্যাদি যে সব কর্ম–কাণ্ড ঘটছে সবগুলো সম্পর্কেই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এবং উম্মতকে এগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। হাদীছ শরীফে আছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

((لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان))

অর্থ: "ক্বিয়ামত ক্বায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের

একটি জনপদ মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং আমার উম্মতের কতিপয় দল প্রতিমাপূজায় লিপ্ত হবে।"

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহীদের অংগনকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ করে গেছেন এবং শিরক পর্যন্ত পৌছার যাবতীয় পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। সেজন্য তিনি কবরকে প্লাস্টার করতে এবং উহার উপর মঠ তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। এর প্রমাণ, মুসলিম শরীফে হজরত জাবের (রাজিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ। উক্ত হাদীছে একথাও ছাবিত রয়েছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজরত আলী (রাজিয়াল্লাহু আনহু) কে এই নির্দেশ সহকারে পাঠিয়েছিলেন যে তিনি যেন প্রতিটি উঁচু কবর সমতল করে দেন এবং প্রতিটি প্রতিমা নিশ্চিহ্ন করে দেন। এজন্য একাধিক উল–ামাগণের অভিমত হলো: কবরের উপর নির্মিত গম্বুজগুলো ধ্বংস করা ওয়াজিব। কেননা, এগুলো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তৈরী করা হয়েছে।

এই বিষয়টিই আমাদের ও অপর লোকদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে, তারা আমাদেরকে কাফের বলে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং আমাদের রক্ত ও আমাদের মাল–সম্পদ তারা হালাল মনে করে। অবশেষে, আল্লাহপাক তাদের উপর আমাদের জয়ী করেন এবং তাদের উপর আমরা আধিপত্য লাভ করি। তাওহীদ সংক্রান্ত এই বিষয়টির প্রতিই আমরা লোকদের আহ্বান করি, এরই ভিত্তিতে আল্লাহর কিতাব, রাসূল(ছাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া

সাল্লাম) এর সুন্নাত এবং মুসলিম উম্মতের সালফে ছালিহীনদের অভিমতের আলোকে তাদের প্রতি আহ্বান জানানোর পর আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত আদেশ পালনার্থে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করি।

আল্লাহপাক বলেন ঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থ:" এবং তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হবে এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।" (সূরা আন্ফাল–৩৯)

সুতরাং যারা দলীল প্রমাণাদি ও স্পষ্ট বয়ানের মাধ্যমে এই আহ্বানের প্রতি সাড়া না দেয়, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও ভাষার দ্বারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

আল্লাহপাক বলেন ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ

অর্থ:" নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এবং তাদের সংগে পাঠিয়েছি কিতাব ও ন্যায়–নীতির মাণদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি

যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড রণ—শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ প্রকাশ্য জেনে নিবেন, কে সরাসরি প্রতক্ষ্য না করেও তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে? আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।” (সূরা হাদীদ—২৫)

আমরা লোকদেরকে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে জামাতের সাথে নামাজ প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, রমজান মাসের ছিয়াম পালন ও বয়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ পালনের আহ্বান জানাই। এইভাবে আমরা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ প্রদান করে আসছি।

আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

অর্থ:“আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্রই এখতিয়ারভুক্ত ।” (সূরা হাজ্জ—৪১)

এটাই আমরা বিশ্বাস করি এবং এরই ভিত্তিতে আমরা আল্লাহ্র ধর্ম—কর্ম সম্পাদন করি। যে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমল করবে সে আমাদের মুসলিম ভাই, আমাদের যে অধিকার তারও সেই অধিকার এবং আমাদের উপর যে দায়িত্ব বর্তাবে তার উপরও সেই দায়িত্ব বর্তাবে ।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত, যারা তাঁর সুন্নাতের অনুসারী, কোন বিভ্রান্তিতে একত্রিত হবে না এবং তার উম্মতের একটি দল আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের অপমানকারী বা তাদের বিরোধিতাকারী তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় অবিচল থাকবে।

আল্লাহপাক হজরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ বর্ষণ করুন। (১)

---

(১) 'শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব সপ্তাহ' সংকলন ৮ম খণ্ড পৃ: ১১০–১১৫, ব্যক্তিগত পত্রাবলী; এই সাথে দেখুন, 'আদ দুরারুস সানিয়্যাহ'

চতুর্থঃ

ভ্রান্তি সংশোধনে বাদশাহ আব্দুল আযীযের ভূমিকা

ইসলামী উছমানী খেলাফতের পতনের পর বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) হিঃ ১৩৪৩ সনে মক্কা শরীফে যখন প্রবেশ করেন এবং পরবর্তীতে মদীনা মুনাওয়ারা ও জিদ্দা নগরী যখন তাঁর নেতৃত্বে নব্য উদীয়মান রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে তখন বহু বৈদেশিক গোষ্ঠী বিভিন্ন অপবাদ তাঁর প্রতি ছুঁড়ে মারে, যা থেকে তিনি সত্যিকার অর্থে বহু দূরে ছিলেন।

তাঁরা বলল: বাদশাহ আব্দুল আযীযের মাজহাব হলো 'ওহ্হাবী' এবং এটা প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত চার মাজহাবের বাইরে পঞ্চম এক মজহাব। তিনি হরমাইন শরীফাইনের পবিত্রতা বিনষ্ট করেছেন, তাঁর দল বোমার দ্বারা রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদে আঘাত হেনেছে, তারা সম্মানিত মদীনাবাসীর মর্যাদাহানী করেছে, তারা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মহব্বত করে না এবং তাঁর উপর দরূদ ও পড়ে না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক মিথ্যা অপবাদ, যা এর আগেও বহুবার বিভিন্ন মহল থেকে প্রচার করা হয়েছে।

এক পর্যায়ে ভারত থেকে 'আহ্লে হাদীছ' সংগঠণের একদল

আলেমে দ্বীন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগমণ করেন। তারা হজ্জ সমাপণের পর মদীনায় অবস্থিত 'মসজিদে রসূল' যিয়ারত করেন। এই সফরের ফলে তাদের কাছে উপর্যুক্ত মিথ্যা অপবাদসমূহের অসারতা প্রমাণিত হয়। অবশেষে, তারা এই সংকল্প নিয়ে ভারত প্রত্যাবর্তন করেন যে, তারা সেখানে গিয়ে এইসব ভিত্তিহীন অপবাদের জবাব দিবেন এবং তারা যা দেখে গেলেন তার প্রকৃত চিত্র লোকের সম্মুখে তুলে ধরবেন। তারা সেখানে পৌঁছে অপবাদকারীদের দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের পাল্টা দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বিশেষ করে 'আহ্লে হাদীছ,' 'আখবারে মুহাম্মদী,'ও'জমিদার',পত্রিকায় বাদশাহ আব্দুল আযীয, মক্কা ও মদীনা উভয় হরম শরীফে তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রম, হাজীদের নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থা, তাঁর আক্বীদাহর বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর দ্বীন সংরক্ষণের প্রতি তাঁর উদ্যম-উদ্দীপনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

আমরা দেখতে পাই, বাদশাহ আব্দুল আযীয যে আক্বীদাহর ধারক ও বাহক ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে উহার তাৎপর্য ও হক্বীক্বত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দিকে সেই সম্পর্কে লিখিত বইপত্র প্রেরণ করেন এবং হজ্জ প্রতিনিধিদের সম্মুখে প্রতি বছর এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এইসব চিঠিপত্র ও সাক্ষাৎকারে তিনি লোকদের সম্মুখে যে বক্তব্য তুলে ধরতেন তার একটা চিত্র আমরা তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণে দেখতে পাই যা তিনি ১৩৪৭হি: সনে জিলহাজ্জ মাসের প্রথম তারিখে (মোতাবেক ১১/৫/১৯২৭ খৃী:) মক্কার রাজপ্রাসাদে "এই আমাদের আক্বীদাহ" শিরোনামে প্রদান

করেছিলেন। তিনি সেই ভাষণে বলেছিলেন:

"ওরা আমাদেরকে 'ওহ্হাবী' নামে আখ্যায়িত করে। ওরা আমাদের মাজহাবকে ওহ্হাবী মাজহাব এই হিসেবে বলে যে এটি চার মাজহাবের বাইরে পঞ্চম একটি মাজহাব। এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা, যা স্বার্থান্বেষী মহলের মিথ্যা প্রচারণা থেকে উদ্ভুত।

আমরা নূতন কোন মাজহাব বা আক্বীদাহগত মতবাদের ধ্বজাধারী নই। শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) নূতন কোন বিষয় নিয়ে আগমণ করেননি। আমাদের আক্বীদাহ সালাফে ছালিহীনের সেই বিশুদ্ধ আক্বীদাহ যা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতে বর্ণিত রয়েছে এবং যার উপর সালাফে ছালিহীন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আমরা সুপ্রসিদ্ধ চার ইমামগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি। ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন) এই ইমামবর্গের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করিনা। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁরা সবাই শ্রদ্ধার পাত্র। ফিক্হশাস্ত্রে আমরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাজহাব অনুসরণ করি।

এই সেই আক্বীদাহ যার প্রতি শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) আহ্বান জানান। এটিই আমাদের আক্বীদাহ, আর এটি সেই আক্বীদাহ যা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের উপর

প্রতিষ্ঠিত, নিষ্কলুষ এবং সর্বপ্রকার বেদ্'আত থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এই তাওহীদী আক্বীদাহর প্রতিই আমরা লোকদের আহ্বান জানাই, আর এই আক্বীদাহই আমাদেরকে আমাদের বর্তমান বিপদাপদ ও সংকট বহুল পরিস্থিতি থেকে রেহাই দান করতে সক্ষম।

আর নবায়নের নামে জনগণকে প্ররোচিত করণের যে প্রয়াস কেউ কেউ চালাচ্ছেন এই দাবী করে যে, উহা আমাদেরকে আমাদের বর্তমান পীড়াদায়ক অবস্থান থেকে মুক্তি দান করবে, তা পরম উদ্দশ্য সাধনে এবং আমাদেরকে পারলৌকিক পরম সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে মোটেই সক্ষম নয়।

প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানগণ ততদিন কল্যাণে আপ্লুত থাকবে যতদিন তারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । তারা কেবল কালিমায়ে তাওহীদ খালেছ ভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের সোপানে পৌঁছতে পারে।

আমরা এমন নবায়ন চাই না, যা আমাদেরকে আমাদের দ্বীন ও আক্বীদাহ থেকে বঞ্চিত করে দিবে। আমরা চাই, মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে কাজ করবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট, তিনিই হবেন তার সাহায্যকারী। সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে ধর্মে নবায়নের প্রয়োজন নেই, তাদের প্রয়োজন ধর্মের বিধি–নিষেধ মোতাবেক সেই জীবনপদ্ধতির বাস্তবায়ন যার উপর পূর্ববর্তী নেক লোকগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মুসলমানগণ আজ আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আমল থেকে বহু দূরে । তারা যাবতীয় অমঙ্গল ও পাপরাশির মধ্যে নিমজ্জিত। ফলে, আল্লাহপাক তাদেরকে নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন এবং তারা লাঞ্ছনা ও অপমানের যে স্তরে পৌছার ছিল বর্তমানে সেখানে তারা পৌছে গেছেন। তারা যদি আল্লাহপাকের কিতাব ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত পালনে অবিচল থাকতো, তাহলে আজ তারা এই অপমান ও সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো না এবং তারা তাদের নিজস্ব মান-মর্যাদা ও গৌরব হারিয়ে ফেলতো না

আমি যখন আল্লাহর পথে বের হই তখন আমার হাতে পার্থিব কোন সম্পদ ছিল না, আমার জনবলও ছিল না। শত্রুরা চতুর্দিক থেকে আমার উপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালায়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে ও তাঁর বলে বলিয়ান হয়ে আমি তাদের উপর জয়লাভ করি এবং এই সমস্ত শহর-বন্দর জয় করি।

আজ মুসলমানগণ বিভিন্ন মতে ও পথে বিভক্ত। কারণ,তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের উপর আমল ছেড়ে দিয়েছে । এটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত অভিমত হতে পারেনা যে, মুসলমানদের এই বিভক্তি ও মতবিরোধের কারণ হলো বিদেশীরা। এরূপ ধারণা পোষণ করাও বিপদ। আমাদের উপর আপতিত বালা-মছিবতের কারণ আমরা নিজেরাই, বিদেশীরা নয়। একজন বিদেশী লোক অন্য এক দেশে গেল, সেখানে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ স্বদেশী মুসলমান রয়েছে। সে লোকটি একা একা

তার কাজ করবে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, একজন লোকের পক্ষে হাজার হাজার লোকের উপর তার প্রভাব বিস্তার করার সামর্থ্য রয়েছে, যদি এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্য হতে তার সহযোগী ও সাহায্যকারী লোকজন না থাকে।

না, এটা কখনও হতে পারে না। এই সহযোগী ও সাহায্যকারী–দলই আমাদের উপর আপতিত বাল–মছিবতের মূল কারণ। এই সাহায্যকারী দলই আল্লাহর শত্রু এবং তাদের নিজেদেরও শত্রু।

সুতরাং তিরস্কার ও ভর্ৎসনা স্বয়ং মুসলমানদের উপরই পতিত হয়, বিদেশীদের উপর নয়। প্রাচীর শক্ত হলে ধ্বংসকারীদের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না, যদি এর মধ্যে কুঠার ঢুকার মত ছিদ্র না থাকে। এইভাবে, মুসলমানগণ যদি ঐক্যমত ও একতাবদ্ধ হয়ে থাকতো তা হলে তাদের ছত্রভঙ্গ করার বা তাদের ঐক্য বিনষ্ট করার কারো সাধ্য হত না।

এই আরব ও ইসলামের দেশে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা এই আরব উপদ্বীপ ও মুসলিম দেশের ক্ষতিসাধনে বিদেশীদের সাহায্য–সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তারা দেশের মূল ভিত্তি ধ্বংস করতে ও আমাদের ক্ষতিসাধনে কুণ্ঠাবোধ করছে না। ইন শা আল্লাহ, তাদের এই আশা পূর্ণ হবে না। এখনও আমাদের রক্তশিরায় ঈমানের স্পন্দন জারী রয়েছে।

মুসলমানগণ যাবতীয় কল্যাণে আপ্লুত থাকবে, যদি তারা একতাবদ্ধ হয় এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল (ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুসরণ করে চলে । মুসলমান—দের উচিত, এগুলোর উপর আমল করা এবং এগুলোর মধ্যে যে শিক্ষা রয়েছে উহার উপর আমল করতে এবং খালেছ তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানাতে একতাবদ্ধ হওয়া। তখন আমি তাদের দিকে অগ্রসর হব এবং তাদের প্রতিটি কাজে ও প্রচেষ্টায় পাশাপাশি থেকে আমি কাজ করে যাব।

আল্লাহর শপথ! আমি রাজত্ব ও উহার ঔজ্জল্য ভালবাসি না। আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি এবং তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার পথে লোকদের আহ্বান করতে চাই। মুসলমানগণ যেন এই তাওহীদের উপর অঙ্গীকার করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। তখন আমি তাদের সাথে যোগ দিব, বাদশাহ, নেতা বা আমীর হিসেবে নয় বরং তাদের একজন খাদেম হিসেবে।' (১)

---
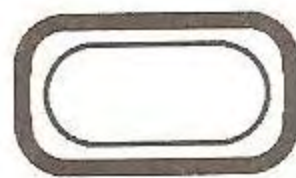
(১) দেখুন, 'আল মাছ্হাফ ওয়াস সাইফ' (ক্বোরআন ও তরবারী), সংকলনে: মজদুদ্দীন আল ক্বাবিসী, পৃ: ৫৫ ও ৫৬।

২৩শে মুহার্‌রাম ১৩৪৮ হিঃ, মোতাবেক ১লা জুলাই ১৯২৯ খৃীষ্টাব্দে এক বক্তৃতায় বাদশাহ আব্দুল আযীয বলেন ঃ

"আপনারা ভাল করেই জানেন, কিছু লোক হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীম হতে বহু দূরে অবস্থান করছে। তারা শয়তানের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এটা হয়েছে কিছুসংখ্যক লোকের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার ফলে, যারা ইসলামের দাবী করে এবং বাহ্যিকভাবে ইসলামের প্রতি দরদ প্রকাশ করে। আল্লাহ সাক্ষী আছেন, এইসব লোক থেকে আমাদের দ্বীন পবিত্র ও বিমুক্ত এবং তাদের কর্মকাণ্ড থেকেও দায়মুক্ত। আমি পূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলছি: আমি বিদেশীদের ভয় করি না, যতটুকু ভয় করি আমাদের কিছু সংখ্যক মুসলমানকে। বিদেশীদের ব্যাপার সুবিদিত এবং তা থেকে সতর্ক থাকা সহজ ও সম্ভব। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা ও কুমন্ত্রণা ব্যর্থ করার প্রস্তুতি গ্রহণ সম্ভব ।

এই সাথে আরো বলা যায় যে, বিদেশীরা ইসলামের নামে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে মোটেই সমর্থ নয়। আর কিছু সংখ্যক মুসলমান আছে, যারা এখনও ইসলাম ও মুসলমানদের নামে নজদ ও নজদবাসীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এরা যুগযুগ ধরে মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে রয়েছে এবং তাও ইসলামের নামে ।

উছমানী সম্রাজ্য, যা ইসলামী সম্রাজ্য হিসেবে মুসলিম উম্মতের অনেকটা নিকটবর্তী অবস্থানে ছিল, ইসলাম ও মুসলমানদের নামে আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল এবং চতুর্দিক থেকে আমাদের ঘেরাও করলো। মাদ্হাত পাশা ক্বাতীফ ও আহ্সার দিক থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করলো, উক্ত সম্রাজ্য হিজাজ ও ইয়ামনের দিক থেকে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে এবং উত্তর দিক থেকেও উহার সৈন্যদল আমাদের উপর চড়াও করে ।

মোটকথা, আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং আমাদের মূল কেন্দ্রে আঘাত হানার জন্য এই সব সৈন্যরা আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। তারা আমাদের সাথে এই মনে করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যে, 'ওহ্হাবী আন্দোলন' একটি নূতন মাজহাব, শায়খ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব এক নূতন বেদ্'আত নিয়ে এসেছেন এবং ওহ্হাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব ইত্যাদি ধরণের অনেক সাজানো ও আকর্ষণীয় উক্তি ছড়ায়ে সহজসরল সাধারণ লোকজনের মনমস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তারে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে, সাধারণ লোক বহুলাংশে তাদের এই বক্তব্যসমূহে প্রভাবিত ও আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহপাক আমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে রাখেন ।

উছমানী সাম্রাজ্যের লোকগণ ছাড়া বর্তমানে অন্যান্যরাও এরূপ কাজ করে চলছে । প্রতিটি দিক থেকে আমাদেরকে ঘেরাও করা হয়েছে। এরাও ধর্মের নামে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে।

কিন্তু আল্লাহপাক আমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেছেন এবং তাঁর 'কালেমা'ই সবকিছুর উর্ধে রেখেছেন। আল্লাহপাক আমাদের জয়ী করেছেন অন্তরে নিহিত তাওহীদী শক্তি বলে এবং বক্ষে সংরক্ষিত ঈমানের জোরে। আল্লাহপাক ভাল করেই জানেন, তাওহীদ আমাদেরকে শুধু আমাদের অস্থি ও রক্তমাংশের এই দেহের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেনি বরং কর্তৃত্ব প্রদান করেছে আমাদের আত্মা ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর। আমরা তাওহীদকে আমাদের স্বার্থসিদ্ধি, প্রবৃত্তির দাবী পূরণার্থে বা গণিমতের সম্পদ লাভের জন্য অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করিনি; আমরা তা গ্রহণ করেছি দৃঢ়ভিত্তিক আক্বীদাহ ও শক্তিশালী ঈমানের আলোকে, যাতে আল্লাহর 'কালেমা'ই সবকিছুর উর্ধ্বে থাকে। (দেখুন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৫৮ ও ৫৯)

সর্বশেষে, এই বিনীত প্রচেষ্টার পর আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র আমলকে তাঁরই জন্য খালেছ করে দেন এবং এর দ্বারা শিক্ষার্থী ও জ্ঞানান্বেষীদের উপকৃত করেন ।

الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.

حَوْلَ الوَهَّابِيَّةِ

تأليف

معالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر

مستشار سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية

ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية

نقله إلى اللغة البنغالية

محمد رقيب الدين أحمد حسين

طبع ونشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء

الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقف لله تعالى

الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م